ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল,
ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

[Political Economy of Land Laws
Khas Land, Jalmahal, Acquisition and Requisition, and Land Use Laws, Policies and Implementation Problems in Bangladesh]

স্বত্ব ২০২২ © লেখকবৃন্দ

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে অরনি বারকাত
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৫৮১৫০৩৮১ মোবাইল: ০১৯৭৭৯৯২২৬৮, ০১৭৫৬১৪২৩১৫
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

ISBN: 978-984-95689-4-0

লেখকবৃন্দ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারীবৃন্দের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

এই গ্রন্থের বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট মাঠজরিপ কাজে গবেষণা সহায়তা দিয়েছে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'। গ্রন্থে বিবৃত সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-এর দায়-দায়িত্ব রচয়িতাদের, সহায়ক প্রতিষ্ঠান এইচ ডি আর সি, নিজেরা করি এবং আইসিসিও কোঅপারেশন-এর নয়।

মূল্য: ৬০০ টাকা, ইউএস ৪০ ডলার, ইউরো ৩০, ব্রিটিশ পাউন্ড ২৫

উদ্ধৃতি সুপারিশ: বারকাত, আবুল., ওসমান, আসমার., সোহরাওয়ার্দী, গাজী, মোহাম্মদ., এবং ইসলাম, মো. অলিউল (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

ভূমিহীন-দরিদ্র-প্রান্তিক ও আদিবাসী মানুষকে—

সূচিপত্র

ভূমিকা ***xiii-xv***
কৃতজ্ঞতা ***xvii-xx***

মুখবন্ধ: বড় পর্দায় ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা **১-৩৩**

অধ্যায়

১ সূচনা **৩৫**
প্রেক্ষিত ৩৬
উদ্দেশ্য ৩৯
গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্বিয় বিষয়াদি ৩৯
অধ্যায় বিন্যাস ৫৪

২ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত **৫৭**
২.১ ভূমিকা ৫৮
২.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ৬০
২.৩ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ৬৩
২.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬৬
২.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা ৬৮
২.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ৮৪
২.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং ৮৯
২.৮ সুপারিশমালা ৯২

৩ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত **৯৫**
৩.১ ভূমিকা ৯৬
৩.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ৯৭
৩.৩ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ৯৯
৩.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০২
৩.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা ১০৩
৩.৬ নীতিমালার ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ১০৮
৩.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং ১১৩
৩.৮ সুপারিশমালা ১১৬

৪ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ১১৯

৪.১ ভূমিকা ১২০
৪.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১২৩
৪.৩ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১২৪
৪.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতি: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১২৮
৪.৫ নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা ১৩০
৪.৬ নীতির ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ১৪০
৪.৭ নীতি এবং তা বাস্তবায়নের ভালো-মন্দ: স্কোরিং ১৪৯
৪.৮ সুপারিশমালা ১৫১

৫ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ১৫৫

৫.১ ভূমিকা ১৫৬
৫.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৫৭
৫.৩ অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ১৫৮
৫.৪ একনজরে বিদ্যমান আইন: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৬২
৫.৫ আইন বাস্তবায়ন সমস্যা ১৬৫
৫.৬ আইনের ব্যত্যয়: বাস্তব উদাহরণ ১৭৩
৫.৭ আইন এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং ১৮০
৫.৮ সুপারিশমালা ১৮৩

৬ ভূমি ব্যবহার ১৮৭

৬.১ ভূমিকা ১৮৯
৬.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৯০
৬.৩ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ১৯১
৬.৪ একনজরে বিদ্যমান নীতিমালা: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৯৪
৬.৫ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা ১৯৬
৬.৬ নীতির ব্যত্যয়: দু'টি বাস্তব উদাহরণ ২০১
৬.৭ নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ভালোমন্দ: স্কোরিং ২০৭
৬.৮ সুপারিশমালা ২১০

৭ উপসংহার ২১৩

তথ্যপঞ্জি ২২১

ছক

ছক ১ স্কোরিং-মান দিয়ে 'আইন' ও 'আইন বাস্তবায়ন' অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকাঠামো ১৯

সারণি

সারণি ১	"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি সমস্যার নমুনা স্কোরিং	৫১
সারণি ২	"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যার নমুনা স্কোরিং	৫২
সারণি ৩	খাসজমিসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও এর সংশোধনীসমূহ	৬১
সারণি ৪	স্কোরিং—আদর্শ আইন থেকে প্রকৃত আইনের দূরত্ব ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২১৪
সারণি ৫	স্কোরিং—আইন বাস্তবায়নের আদর্শ অবস্থা থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের দূরত্ব ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২১৫

লেখচিত্র

লেখচিত্র ১	"আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন"-এর পরিমাপ-সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহ	২০
লেখচিত্র ২	স্কোরিং—"ঋ-আইন, ২০২১" এর আইনি অবস্থা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫১
লেখচিত্র ৩	স্কোরিং—"ঋ-আইন, ২০২২" এর আইন বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫৩
লেখচিত্র ৪	"ঋ-আইন, ২০২১": আইন এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৫৩
লেখচিত্র ৫	বাংলাদেশে খাসজমির প্রকারভেদ	৫৯
লেখচিত্র ৬	বিগত ২০০ বছরে খাসজমিসম্পর্কিত আইন ও সংশোধনীর বিবর্তন	৬১
লেখচিত্র ৭	স্কোরিং—'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭'-এর আইনি সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯০
লেখচিত্র ৮	স্কোরিং—'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯১
লেখচিত্র ৯	'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	৯২
লেখচিত্র ১০	স্কোরিং—'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর আইনি সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১১৪

লেখচিত্র	১১	স্কোরিং—'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫'-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১১৫
লেখচিত্র	১২	'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫': নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১১৫
লেখচিত্র	১৩	২০ একরের নিচের জলমহালের ইজারা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ	১৩৫
লেখচিত্র	১৪	স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৪৯
লেখচিত্র	১৫	স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৫০
লেখচিত্র	১৬	'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯': নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৫১
লেখচিত্র	১৭	স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৮১
লেখচিত্র	১৮	স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৮২
লেখচিত্র	১৯	'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-২০১৭': আইন এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	১৮২
লেখচিত্র	২০	স্কোরিং—'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর আইনি সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২০৮
লেখচিত্র	২১	স্কোরিং—'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২০৯
লেখচিত্র	২২	'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১': নীতি এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার স্কোরিং-এর মধ্যে তুলনা ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২০৯
লেখচিত্র	২৩	গবেষণাকৃত ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং বাস্তবায়ন সমস্যার তুলনামূলক চিত্র ('০' এর '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)	২১৬

পরিশিষ্ট **২৩১**

১ গবেষণাধীন ভূমি আইন ও নীতিমালাসমূহ ২৩৩-৩০৩

২ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত পূর্বের গবেষণানির্ভর সংশ্লিষ্ট আইনি প্রস্তাবনাসমূহ ৩০৫-৩৫৭

৩ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ৩৫৯-৩৭৬

৪ এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষণাদল ৩৭৭-৩৭৯

নির্ঘণ্ট ৩৮১-৪১১

ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষ চিরকালই অধিকারবঞ্চিত। বিশেষ করে, যারা অর্থনৈতিক বিচারে দরিদ্র, ধর্মীয় সম্প্রদায়, পেশার নিরিখে সংখ্যালঘু—তাদের বঞ্চনা ও অধিকারহীনতা সর্বত্র। নারী, যারা এ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, তারা কিছু মাত্রায় ক্ষমতায়িত হয়েছেন বটে, তবে তাদের মুক্তি এখনো সুদূরপরাহত। এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, একটি সুসংহত আইনি ব্যবস্থা মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেল, অথচ এমন একটি মানবিক আইনি কাঠামো দাঁড়াল না—যা মানুষের সার্বিক ও মানবিক বিকাশকে সহজ করবে। তার ওপর, আমাদের পুরো আইনি ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনো রয়ে গেছে সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার হীন অভিপ্রায়; অগুনতি আইনি অসংগতির কথা তো বলাই বাহুল্য।

কত রকম সরকারই তো আমরা দেখেছি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়—রাজনৈতিক, অর্ধরাজনৈতিক, ছদ্মরাজনৈতিক, অরাজনৈতিক। দেখেছি নানান রঙে, নানান মোড়কে আচ্ছাদিত প্রশাসনসহ সরকারের নানান হাতিয়ার। ন্যায্য একটি আইনি কাঠামো প্রণয়নে নানান সময়ে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও সেগুলো এতটাই বিচ্ছিন্ন-দূরদৃষ্টিহীন-জনসংযোগহীন ছিল যে ওই আইনি পরিবর্তনের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। পাশাপাশি এ কথাও নিরেট সত্য যে, আমাদের দেশে অনেক নীতি আর আইন আছে বটে– কিন্তু, সেগুলো কালো অক্ষরের ঘেরাটোপে আজো বন্দী; আইন ও তা বাস্তবায়নের মাঝে ব্যবধান বিস্তর। তেমনি, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সদিচ্ছার অভাবে একটি ভালো আইনের মন্দ প্রয়োগও অতি সাধারণ একটি বিষয়। আর এ কথা তো দিবালোকের মতোই পরিষ্কার—আমাদের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোটাই এমন যে তা জনমানুষের দুর্ভোগে বিচলিত নয় মোটেও। উল্টো, ভোগান্তি উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামোই চিরকাল হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটেছে, হাঁটছে।

পরিতাপের বিষয়, যে দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা আবর্তিত হয় জমি-জলা-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে; যে দেশের প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে কৃষকের হাতে—সে দেশের ভূমি আইনগুলো জনবান্ধব নয়, কৃষিবান্ধব নয়, পরিবেশ-প্রতিবেশ বান্ধবতো নয়ই। বিশেষ করে, যারা আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী—দরিদ্র মানুষ, নারী– তাদের জন্য ভূমি আইন যেন আরো বৈরী, খড়্গহস্ত। সর্বোপরি, দগদগে ঘায়ের মতো আইন এবং তা বাস্তবায়নের মাঝে চোখে পরে

বিপুল এক দূরত্ব। আইনের ভালোটুকু পালিত হয় না, পালিত হয় মন্দটুকু। আইনে যা বলা আছে তা পালনে বিস্তর অনীহা, যা বলা নেই সেটি পালনের মহোৎসবই যেন সর্বত্র দৃশ্যমান। জাল যার জলা তার নয়, যিনি কৃষক তিনি ভূমিহীন। ভূমির সঠিক ব্যবহার আজো নিশ্চিত হলো না, বেঠিক ব্যবহারই যেন নিয়ম। প্রান্তিক মানুষের নেই ভূমিতে মালিকানা, এমনকি অভিগম্যতাবঞ্চিতও সে। ক্ষমতাকাঠামোর বাইরের মানুষ যারাই—এ দেশের প্রায় সবাই, ভূমি বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমায় তারাই নিঃস্ব, ক্ষতিগ্রস্ত।

এমনি এক বৈরী-প্রতিকূল পরিবেশে, ১৯৮০ সাল থেকে কাজ, করছে 'নিজেরা করি'। আমাদের লড়াই সমাজের ক্ষমতাকাঠামোর সাথে। জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবরকম নির্যাতন ও বঞ্চনামুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রাম নিজেরা করি'র সাংগঠনিক উদ্দেশ্য। শুরু থেকেই আমরা গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য ও বিপন্নতার কারণ নির্ণয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। মজুরিশ্রমিক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি এবং অন্যান্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী প্রথম থেকেই আমাদের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। আমাদের সৌভাগ্য, এই লড়াইয়ের সাথি হয়েছেন দেশে-বিদেশে আমাদের অনেক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। সহমর্মী অনেক সংগঠন হয়েছে আমাদের সঙ্গী। অনেক আনন্দ-বেদনার সহচর আমার সহকর্মী এবং দলের সদস্যদের মানুষের অধিকার আদায়ের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তার কোনো তুলনা নেই। সময়োপযোগী, গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণাগ্রন্থের প্রকাশলগ্নে আমি তাদের সবার ভূমিকাকে অকণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের নিত্য বিশ্বাস, 'চেতনায়নেই উন্নয়ন'। মানুষকে অজ্ঞতায় রেখে কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। আমরা জানি, প্রামাণ্য-গবেষণানির্ভর জ্ঞান ছাড়া যেকোনো অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হয়ে ওঠে দুরূহ থেকে দুরূহতর। খেলো আর চটজলদি বাজার পায় এমন কথায় সভা-সেমিনার গরম করা যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে জীবনপরিবর্তনকারী সংগ্রামে সাফল্যের জন্য চাই প্রামাণ্য দলিল, গবেষণানির্ভর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ।

মাঠে, মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি—আমাদের দেশের মানুষের জীবনে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম; শুধু অর্থনৈতিক উপযোগীতাতেই নয়, ভূমির ওপর পূর্ণ অধিকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। তাই, 'নিজেরা করি' ভূমির ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের যেকোনো উদ্যোগে পাশে থাকতে চেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায়, ভূমিসংক্রান্ত আইনের অগুনতি ব্যত্যয় এবং আইনের অধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদে পদে সীমাহীন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত, 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর গবেষণা এবং 'মুক্তবুদ্ধি'র এই প্রকাশনা উদ্যোগের সাথে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত, আনন্দিত। আমার স্মরণ করতে ভালো লাগছে যে, প্রথিতযশা গবেষক, গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর অনন্য নেতৃত্বে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর একদল দক্ষ গবেষককে বরাবরই পাশে পেয়েছি আমরা। বিশেষ করে অধ্যাপক বারকাতের উজ্জ্বল, অসামান্য মেধা ও পাণ্ডিত্যই শুধু নয়, তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্দীপন,

যেকোনো অশোভনের বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় ভূমিকা নিজেরা করি'র লড়াইকে করেছে বেগবান, যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে গবেষণার ঘাটতি অনস্বীকার্য। বিশেষত, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ—নারীর ক্ষেত্রে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন আলোচনা হলেও, এ বিষয়ে গবেষণানির্ভর গ্রন্থের অভাব রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রকাশনাটি যেমন এসংক্রান্ত সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে, তেমনি ভূমি-অধিকার নিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুসংহত সংগ্রামের জ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের সংগ্রাম চলমান রইবে, জ্ঞান এবং যুক্তির সম্মিলনে—নির্ভরতায়।

সবুজ-বিস্তীর্ণ জমি, টলমলে জলা আর নিবিড় জঙ্গলের ভালোবাসা মেখে বাংলার জনমানুষ আজন্ম লালিত। প্রকৃতির কাছ থেকে ওরা সযত্নে নেয় প্রত্যহের পাঠ। অথচ, তাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে শুধু হতাশা আর বঞ্চনার ছোঁয়া। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা—এই দেশে প্রণীত হোক সঠিক ভূমি আইন, হোক যথাযথ আইনি সংশোধন এবং এসবের সময়নিষ্ঠ-সঠিক বাস্তবায়ন। জীবনের উপবনে দাঁড়িয়ে ভূমির অধিকার হারানো এই মানুষগুলো যেন দেখে প্রত্যাশার নতুন সূর্যের সোনালী কিরণ ওদের জন্য প্রাণের বাণী বয়ে এনেছে—ওরা ফিরে পেয়েছে ভূমির অধিকার। আমাদের অবিচল বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি সেই প্রত্যাশা পূরণে পথ দেখাবে—আলোর সন্ধান দেবে।

খুশী কবির
সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশে 'ভূমি আইন' ও 'ভূমি আইনের বাস্তবায়ন'সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তনির্ভর গবেষণা নেই বললেই চলে। এই বিবেচনা থেকেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি'-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একটি মাঠজরিপভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে। ওই গবেষণা রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছিলেন আবুল বারকাত, গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আসমার ওসমান, হাসনা হেনা শাওলি এবং মো. অলিউল ইসলাম। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণা এবং পরবর্তীকালে মাঠজরিপভিত্তিক এসব তথ্যাদি প্রয়োগে ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিনির্মাণউদ্দিষ্ট এই গ্রন্থটি প্রকাশের সময়োচিত উদ্যোগ নেয়ায় 'নিজেরা করি' এবং সংস্থাটির সমন্বয়কারী খুশী কবিরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই দুরূহ কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছেন 'নিজেরা করি'-এর রেজানুর রহমান রোজ, তাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

দেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-চর-হাওর-বাঁওড়-বনের-পাহাড়ের যেসব মানুষ মাঠজরিপের প্রতিটি স্তরে সাহায্য করেছেন, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। গ্রীষ্মের খরতাপে ঘর্মক্লান্ত সেই কৃষক-জলাজীবী-বনজীবীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, যাঁরা বিনাস্বার্থে আমাদের সাথে মন খুলে কথা বলেছেন। দরিদ্র-ভূমিহীন ওইসব মানুষকে আমরা সবসময় মনে রাখব, যাঁরা অন্তরের গভীর থেকে সত্যটুকু বলেছেন। এ দেশে সত্য কথা বলা যখন দুর্লভ, তখন তাঁদের এই অবস্থান আমাদের প্রাণিত করে।

গ্রামের টিমটিমে আলোর কোনো চা-দোকানের অনেক সন্ধ্যার শাণিত আলাপ, ক্ষেতের আলে কৃষকের দার্শনিক উপলব্ধি, শীতের রাতে ভূমিহীন মানুষের ভূমি গ্রাসের করুণ-নিষ্ঠুর গল্প আমাদের অবনত করে, শেখায়, বিনীত করে। ওই মানুষদের উষ্ণ হৃদয়, সমুদ্রসম আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা, নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও সময়, ঠোঁটের কোণে সবের পরেও লেগে থাকা নির্মল হাসি, এবং সত্য বলবার দূর্মর সাহস ব্যতীত আমাদের মতো 'বাইরে থেকে যাওয়া অদরিদ্র' মানুষের পক্ষে এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হতো না। তাঁদের অমূল্য ও সময়নিষ্ঠ সহায়তা না পেলে এই গবেষণাকর্মটির বাস্তবায়ন অসম্ভবই ছিল।

তাঁদের, যাঁদের নাম আমরা প্রকাশ করতে পারছি না গবেষণা নৈতিকতার খাতিরে— প্রত্যেকের শুভার্থী হিসেবেই থাকব আমরা; কামনা করব তাঁদের সুস্বাস্থ্য, এবং মনেপ্রাণেই চাইব যে তাঁরা না-হলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত যেন এই ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা থেকে উদ্ভূত ফাঁদের কবল থেকে মুক্তি পান। আমরা

তাঁদের জন্য এমন একটি শোভন সমাজের অপেক্ষা করব; আমাদের এই গবেষণার মতো ক্ষুদ্র সহযোগিতা সেই যাত্রায় অব্যাহত রাখবার বিনীত অঙ্গীকারও রইল আমাদের পক্ষ থেকে।

বেশকিছু সংগঠনের সদস্য এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মির্জা মোঃ আজিম হায়দার, কর্মসূচি কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), এএলআরডি; সঞ্জীব দ্রং, মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; প্রবীন স্নাল, মানবাধিকার কর্মকর্তা, আইপিডিএস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; পরিতোষ দ্রং, কমিউনিটি সংগঠক, আইপিডিএস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; মিঠুন জাম্বিল, মানবাধিকার কর্মকর্তা, আইপিডিএস, মধুপুর, টাঙ্গাইল; নিগার সুলতানা কেয়া, নারী ভাইস-চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক, নারী উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা সদর, সুনামগঞ্জ; সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ইরা, সুনামগঞ্জ; তৌহিদুল ইসলাম (রুবেল), সাব-রেজিস্ট্রার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধিকার কর্মী জুমলিয়ান আমলাই এবং সুদত্ত বিকাশ তঞ্চংগ্যা তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের বেশি সময় ধরে সংগঠিত এই গবেষণাকর্মে রংপুর, গাইবান্ধা, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল এবং খুলনার 'নিজেরা করি'র স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তারা হলেন—মামুনূর রশিদ, বিভাগীয় সমন্বয়ক, রাজশাহী বিভাগ; গৌতম কুমার দে সরকার, বিভাগীয় সংগঠক, রাজশাহী বিভাগ; আলমগীর হোসেন, অঞ্চল সমন্বয়ক, গাইবান্ধা; জয়শংকর দাস, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; আহসান আলী, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; শিল্পী রাণী মাহাতো, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; সোনিয়া খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, পীরগঞ্জ উপকেন্দ্র, রংপুর; রেবেকা খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, সাঘাটা উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা; আলেয়া খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, সাঘাটা উপকেন্দ্র, গাইবান্ধা; ফজলুল হক, বিভাগীয় সমন্বয়ক, ঢাকা বিভাগ; মুজিবর রহমান, অঞ্চল সমন্বয়ক টিম সদস্য, টাঙ্গাইল; নিরোদ চন্দ্র রায়, কর্মসূচি সংগঠক, মধুপুর উপকেন্দ্র, টাঙ্গাইল; রেখা খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, মধুপুর উপকেন্দ্র, টাঙ্গাইল; স্বপন কুমার দাস, বিভাগীয় সমন্বয়ক, খুলনা বিভাগ; নাসিমা খাতুন, বিভাগীয় প্রশিক্ষক, খুলনা বিভাগ; সাহাদুল ইসলাম, অঞ্চল সমন্বয়ক, পাইকগাছা, খুলনা; পবিত্র সরকার, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; জেসমিন খাতুন, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সুপ্রিয়া রায়, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র,

পাইকগাছা, খুলনা; ধ্রুবল চন্দ্র রায়, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; তরুণ দেবনাথ, কর্মসূচি সংগঠক, নওকাঠী উপকেন্দ্র, পাইকগাছা খুলনা; পরিতোষ দেবনাথ, অঞ্চল সমন্বয়ক, নোয়াখালী; আয়েশা সিদ্দিকা লাকী, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; সুরেশ কর্মকার, কর্মসূচি সংগঠক, আখতার মিয়ার হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; ইদ্রিস আলী ফকির, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; মোঃ জসীম উদ্দীন, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; রেজাউল হোসেন, কর্মসূচি সংগঠক, সমীর হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; নিউটন কুমার মণ্ডল, কর্মসূচি সংগঠক, আখতার মিয়ার হাট উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; লিটন চাকমা, কর্মসূচি সংগঠক, চরবাড্যা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী; এবং ইব্রাহীম খলিল, বিভাগীয় সংগঠক, নিজেরা করি।

তথ্য সংগ্রহে আমাদের সহযোগিতা করেছেন কয়েকজন অভিজ্ঞ মাঠগবেষক, যারা মাঠপর্যায়ের সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সফলভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয়, তারা হলেন—কবির আহমেদ, রফিকুল ইসলাম রাসেল, এবং জ্যোতি চাকমা; নিখাদ আন্তরিকতার সাথে তারা কাজটি সম্পন্ন করেছেন, সে জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার'-এর সহকর্মী-সহযোদ্ধাদের জন্য রইল সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন নুরুন্নাহার, মো. কবিরুজ্জামান লাপ্পু, মোজাম্মেল হক, সাবেদ আলী, আরিফ মিয়া এবং অজয় কুমার সাহা—এদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি উন্নয়নে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশনাবিষয়ক সমন্বয় করেছেন সেলিম রেজা। আর্থিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করেছেন আবু তালেব। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিল্পসুষমামণ্ডিত প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং গ্রন্থসজ্জার কাজটি সৃজনশীলতা ও স্থিতধীর সমন্বয় ঘটিয়ে সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন শিল্পী সব্যসাচী হাজরা। পাণ্ডুলিপির বানানরীতি এবং ভাষাগত সৌকর্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন এস এম তারিকুল ইসলাম মুন্না। ছাপার কাজটি নিখুঁত ও নান্দনিক করার চেষ্টা করেছেন আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং-এর শাহীন আহমেদ ও তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ। তাদের মঙ্গল কামনা করি।

আমাদের মাঠজরিপ কাজ শেষে জরিপের মূল ফলাফল ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় ওয়েবিনারে উপস্থাপনকালে সম্মানিত আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিকুজ্জামান, অধ্যাপক ও প্রাক্তন

চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রানী ইয়ান ইয়ান, উপদেষ্টা, চাকমা সার্কেল চিফ; এবং শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি—সবাইকে তাঁদের মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। তাঁদের চিন্তা-উদ্রেগকারী বহুমাত্রিক আলাপ-আলোচনা পরবর্তীকালে আমাদের এই গ্রন্থে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে।

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

মুখবন্ধ:
বড় পর্দায় ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা

১। "আইন" কানুন-বিধি-বিধান (law), "আইনের ব্যবহার" (use of law), "আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন" (application and implementation of law)—বাহ্যিক দৃষ্টিতে সোজাসাপটা মনে হলেও এসব বিষয় আসলে জটিল। এসবের আছে বাহ্যিক রূপ (form and appearance) এবং মর্মরূপ বা মর্মবস্তু (content and essence); আছে ইতিহাস ও বিবর্তন (history and evolution); আছে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অর্থ (theoretical and practical meaning)। আর এই সবকিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আছে বিভিন্ন পদ্ধতিতত্ত্বীয় কাঠামো (methodology)। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের এসব কাঠামোর মধ্যে সবচে বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ কাঠামো হলো রাজনৈতিক অর্থনীতির পদ্ধতিতত্ত্ব। এ গ্রন্থে আমরা সেটাই ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।

২। "আইন-নিয়ম-বিধান"-এর কথা এলেই বলতে হয় 'প্রকৃতির weavb' (rule/law of nature) এবং "সামাজিক বিধান" (rule/law of society)।[১] এ দু'টো একদিকে যেমন

---

[১] "প্রকৃতির বিধান" নিয়ে কাজ করে 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' *(natural science)* আর "সামাজিক বিধান" নিয়ে কাজ করে "সামাজিক বিজ্ঞান" *(social science)*। আর জ্ঞানতত্ত্বের নিরিখে *(epistemologically)* "প্রকৃতিবিজ্ঞানের" সাথে "সামাজিক বিজ্ঞানের" সম্পর্কটি পদ্ধতিতত্ত্বগতভাবে *(methodologically)* গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণে—একটা ভ্রান্ত ধারণাকাঠামো *(flawed framework)* ব্যবহার করে আসছেন, যার নাম কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো *(cartesian framework)*। জ্ঞানতাত্ত্বিক ভ্রান্ত এই ধারণাকাঠামো বুঝতে একটু পেছনে যেতে হবে। সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রী রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) বস্তুর গতি, মানুষের মন ও দেহ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা বলেছেন, যা এ রকম: "বস্তু গতিময়; তবে বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর"। গতি ও স্থিতি উভয়ই তৈরি করেন ঈশ্বর। মানুষ হচ্ছে 'দেহ' ও 'মন'-এর সম্মিলিত সংগঠন। দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু; আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা। দেহ আর মন চরিত্রগতভাবে পরস্পরবিরোধী। সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে—যে ভিত্তি সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে (= ঈশ্বর)। মূল সিদ্ধান্ত হলো *"কাজিটো আরগোসাম"*—"আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে"। জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্রগুলো ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন। ঈশ্বরসৃষ্ট বিধায় ওইসব সূত্র সন্দেহাতীত। আর সন্দেহাতীত সূত্রের ভিত্তিতে যুক্তিপরম্পরায় লব্ধ যেকোনো জ্ঞান সঠিক হতে বাধ্য"। এরপর এল জ্ঞানানুসন্ধানে কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো। কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো যা করল, তা হলো এ রকম: দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলল মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' *(res cognitans)* নিয়ে; আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' *(res extensa)* নিয়ে। জ্ঞানজাগতিক এ সবকিছু চ্যালেঞ্জ করে বিজ্ঞানী ফ্রিট্জফ কাপ্‌রা যা বললেন, তা এ রকম: "প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন হলো কার্টেজীয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলোজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" গ্রহণ করা—অর্থাৎ যে "চিন্তা-অবস্থান" দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণিজগতের সম্পর্ক নিরূপণ করে হবে,... সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে—তারা সামূহিক-আন্তঃসম্পর্কিত গঠনকাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক

এক অথবা সমার্থক নয়, অন্যদিকে "সামাজিক আইন-বিধান" যখন "প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান-নিয়মের" সাথে সাংঘর্ষিক হয় তখন শেষপর্যন্ত জয় হয় "প্রকৃতির বিধান"। আর এ নিরিখে সামাজিক বিধি-বিধান-আইন যদি প্রকৃতির বিধান পাল্টে দেবার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় তখনই বিপদ সৃষ্টি হয়—যে বিপদ শেষপর্যন্ত সংঘবদ্ধ মানবসমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। সুতরাং সমাজদেহের অস্তিত্ব বিপন্ন না করতে চাইলে 'সামাজিক বিধি-বিধান-আইন-কানুন'কে "প্রকৃতির বিধি-বিধান"-এর অনুগত-অধীনস্থ হিসেবে দেখাটাই হবে বিজ্ঞানসম্মত।

৩। "প্রকৃতির বিধান" (law of nature) হলো বস্তুজগতের নিত্যগতির নিয়ামক অবিচ্ছেদ্য পরস্পর সম্পর্ক। এসব সম্পর্কের আছে কার্যকারণ (causality)। এসব কার্যকারণের বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি—প্রকৃতি বিজ্ঞানে আবিষ্কারের বিষয়। এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক শর্ত হলো মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ ও প্রকাশ করার শক্তি। প্রকৃতিজগতের বিধান হতে পারে বিশেষ বিধান, সাধারণ বিধান এবং ব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধান। কথাগুলো এ জন্য বললাম যে, মানুষ যেহেতু প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেহেতু "সামাজিক বিধি-বিধান" হতে হবে "প্রকৃতির বিধি-বিধানের" অধীনস্থ। সমাজবদ্ধ মানুষ আর সেই মানুষের "রাষ্ট্র" (যার উৎপত্তিকাল বেশি দিন আগের কথা নয়) যেসব অনুশাসন বা নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে—তাকেই বলা হয় "রাষ্ট্র বিধান" বা "আইন"। এই আইনের লক্ষ্য হলো মানুষের-সমাজের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। নিঃসন্দেহে এই কাজটি কেউ করে এবং কারো স্বার্থে তা করে। কাজটি করে "রাষ্ট্র"; আর স্বার্থটা "রাষ্ট্র-শাসকশক্তির" অনুকূল। আইনের ইতিহাস বলে রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে যেসব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে তাতে একদিকে থাকে শাসকশক্তির স্বার্থরক্ষার নিয়মাবলী আর একই সাথে অতিগুরুত্বের সাথে থাকে 'নিষেধ'—অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রণীত নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির দণ্ডদানের ক্ষমতা। সুতরাং "আইন" হলো একদিকে রাষ্ট্রের শাসকশক্তির স্বার্থ হাসিলের পথ-পদ্ধতি; আর একই সাথে অন্যদিকে তা হলো রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্রের শাসকশক্তির পক্ষে ওই স্বার্থ বিঘ্নিতকারীকে দণ্ডদানের বিধান। সমাজ যেখানে পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত, আর রাষ্ট্রশক্তি যেখানে উপরতলার শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে—সেখানে 'আইন' কোনো শ্রেণিনিরপেক্ষ বিষয় হবার কারণ নেই—তা উপরতলার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ—কারণ, মানুষে মানুষে শ্রেণিবিভাজন প্রকৃতির বিধানসম্মত নয়—তা প্রকৃতির বিধানবিরুদ্ধ (বিশেষ সময়ে বিশেষ বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হলেও)।

বিভাগে চর্চা করে। ..., জীবনের বিষয়াদি খণ্ডিত করার এবং পৃথক গণ্ডিবদ্ধ করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানে সামাজিক বিজ্ঞানীদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না (বিস্তারিত দেখুন, Capra 1988 : 188-262)।#

৪। যেকোনো রাষ্ট্রে মতাদর্শ ও মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠান—রাজনৈতিক, আইনগত, সাংস্কৃতিক—হলো রাষ্ট্রের উপরিকাঠামো (superstructure)। যে উপরিকাঠামোর নিয়ন্তা হলো অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামো (basic structure)। আর ভিত্তিকাঠামোর নিয়ন্ত্রক হলো উৎপাদনসম্পর্ক (production relations) যার। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার মুখ্য নিয়ন্ত্রক হলো উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য (অন্য কোনো কিছু নয়)। সুতরাং যে রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের (জমি-জলা-জঙ্গল, যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি) মালিক হবেন গুটিকয়েক ব্যক্তি, সে রাষ্ট্রে আইনকানুনও যে তাদের স্বার্থেই প্রণীত ও প্রয়োগ হবে—এসব ধ্রুব সত্য। যেমন অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবকালে অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ বললেন, "আইনকানুন স্বার্থরক্ষা করবে সভ্যতার প্রভুদের (Masters of mankind) ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মালিকদের (manufacture) এবং তা করলে সবার জন্যই মঙ্গল হবে"। আর এরপরে বললেন, "প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করবে"। অর্থাৎ 'আইন' বিষয়টি পুরোপুরি 'শ্রেণিস্বার্থীয়' এবং কোনো অর্থেই 'শ্রেণিনিরপেক্ষ' বিষয় নয়। আবার এডাম স্মিথই একদিকে বলছেন যে "এক অদৃশ্য হাত" বাজার ব্যবস্থার মধ্যস্থতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে; আবার অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জনস্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন। এসব হলো "আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির" মর্মকথা।

৫। 'আইন' (law) এবং "আইনের প্রয়োগ অথবা বাস্তবায়ন" (application or implementation of law)—লক্ষ্যটা একই হলেও তা সমার্থক নাও হতে পারে। পার্থক্যটা গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর ধারণার "জ্ঞানের অধিকারী" (possession of knowledge) এবং "জ্ঞানের ব্যবহার" (use of knowledge)-এর মতো হতে পারে। এসবের অর্থ হলো আইনের ঐতিহাসিকতা আছে। যেমন ১৯৭১-এ আমরা যখন মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ করছিলাম, তখন ওই যুদ্ধটা আমাদের জন্য ছিল আইনগতভাবেই ন্যায়যুদ্ধ—ন্যায়সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের যুদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমাদের যুদ্ধ ছিল শুধু বেআইনিই নয়, রীতিমতো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। একই ধরনের উপসংহার প্রযোজ্য ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনবিরোধী লড়াই-সংগ্রামে মঙ্গলপাণ্ডে-ক্ষুদিরাম-বীরকন্যা প্রীতিলতাদের জন্য। 'আইন' ও 'আইনের প্রয়োগ' নিয়ে এসব কোনো ধাঁধা বা স্ববিরোধ নয়—এসবই স্বাভাবিক ঐতিহাসিকতা।

৬। "ভূমি" এবং "আইন" এই দুইয়েই রয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। একটি রাষ্ট্রে—তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন—ক্ষমতাকাঠামো নির্ণায়ক হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান থাকে। আর এই উপাদানগুলো আবর্তিত হয় সম্পদ কেন্দ্র করে। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেই, আর সেই পথেই রাজনীতি—যা ক্ষমতাকাঠামো ঠিক করে—ঠিক করে ভূমির ওপর প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব, এবং অধিকার কার থাকবে, কার থাকবে না। আবার, ভূমি যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ সসীম ও দুষ্প্রাপ্য এক প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই এই সম্পদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যও তুলনামূলক বিচারে বেশি। আবার, ভূমির ওপর অধিকার-মালিকানা-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব-দখল যেহেতু ক্ষমতার পতাকাও ওড়ায় সগর্বে—তারও একটি মূল্য আছে; যা টাকার অংকে হিসাব করা দূরূহ হলেও তা যে মূল্যবান—সেটি বলবার অপেক্ষা রাখে না।

৭। এ তো গেল ভূমির দিকটা। একই সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভূমিসংক্রান্ত "আইন" (law) এবং "নীতি" (policy)। "আইন" আর "নীতির" মধ্যে কিছু ফারাক থাকলেও, আদতে এ দুইয়ের মাঝে ব্যবধান সূক্ষ্ম। "নীতি" নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার, "আইন" প্রণয়নও করে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার। "নীতি" সরকারের আর্থ-রাজনৈতিক দর্শন, যা সরকারের একটি লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে; "আইন" এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্দেশ করে। এমন কোনো "আইনের" অস্তিত্ব থাকতে পারে না যার ভিত্তিমূলে নেই কোনো না কোনো "সুনির্দিষ্ট নীতি"। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো প্রাচীন রোমান দার্শনিক সিসেরোর (খৃ. পূ. ১০৬-৪৩) প্রশ্ন—*Qui Bono*—কার স্বার্থে, কার লাভ বিবেচনায়? নীতির ক্ষমতা কিংবা মামলা লড়ার ক্ষেত্রে তার সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও বলা যায়: যে বিষয়ে "আইন" নেই, সেখানে "নীতিই" (যদি থেকে থাকে) সর্বোচ্চ আইনি দলিল—জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের হয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি। তাই আমরা "আইন" আর "নীতির" মাঝে মৌলিক কোনো ফারাক করতে যাইনি, দুটিকে দেখেছি একই বিবেচনায়।

৮। "আইনের" রাজনৈতিক অর্থনীতির সুস্পষ্ট জন্ম-ইতিহাস আছে। "আইন" কোথা থেকে এল? এলই বা কেন? ভূমিসংক্রান্ত "আইন"—সবসময় ছিল না, সম্ভবত সভ্যতার বেশির ভাগ সময়জুড়েই ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজের কেনো পর্যায়েই ভূমি আইন বলে কিছু ছিল না—কারণ তার প্রয়োজনই পড়েনি। আদিম সমাজের মানুষ জোটবদ্ধভাবে শিকারবৃত্তি ও সংগ্রহবৃত্তি করেছে। তখন ভূমি ছিল সমাজের সবারই—সার্বজনীন সম্পদ। আর ওই সমাজের ভূমি নীতি (land policy) হলো—প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির ব্যবহার হবে সকলের, জীবিকার উৎস হবে সমান। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। যখন থেকে মানবসমাজ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরিত হয়, তখন থেকে ভূমি দখলের প্রচেষ্টা শুরু—প্রথমে শুরু একক কোনো যুথবদ্ধ গোষ্ঠী, আর পরবর্তীতে শুরু হয় এ নিয়ে এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর বিবাদ। আর এসব বিবাদ মেটাতে

এবং ভূমির ওপর কর্তৃত্ব-দখল-নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করতে প্রয়োজন হয় চুক্তি (contract)। এই চুক্তিরই 'সভ্য' নাম হলো 'ভূমি আইন'।

আদিম যুগে শুরুতে আমরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছোট-ছোট গোষ্ঠী বানিয়েছি; বানিয়েছি দলপতি। একপর্যায়ে দলপতি কিছু সম্পদের মালিক হয়েছেন। আরো সম্পদের মালিকানার জন্য তিনি প্রতিবেশী ছোট গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করেছেন—লড়াইয়ে জিতে পরাজিত গোষ্ঠীর সবকিছুর মালিক হয়েছেন। এখান থেকেই শুরু ভ্রাতৃসুলভ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভাঙন—শোষক-শোষিতে সমাজবিভক্তি। এই প্রক্রিয়াতেই এসেছে দাস ব্যবস্থা (slavery)—যে ব্যবস্থায় একদিকে থাকে গুটিকয়েক দাসমালিক, আর অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শৃঙ্খলে আবদ্ধ দাসশ্রমিক। দাস ব্যবস্থা ভৌগোলিকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগে তা রোমান সাম্রাজ্যে এসে মহাপরাক্রমশালী হয়ে রূপ নেয় রাজার শাসনে, গড়ে তোলে শক্তিশালী রাষ্ট্র: ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্র—নগর রাষ্ট্র। রাজা যুদ্ধ করে গ্রাস করতে থাকেন অন্য দাসমালিকদের ছোট ছোট এলাকা-অঞ্চল। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যেতে রাজাকে পুষতে হয় ভাড়াটে সৈন্যদল, আর এই ভাড়াটে সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে পুষতে অর্থায়নে আবিষ্কৃত হয় সোনা-রুপা-তামার 'অর্থ' বা 'মুদ্রা' ('অর্থ' বা মুদ্রার আবিষ্কার সম্ভবত বাজারের সাধারণ পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্য দিয়ে শুরু হয়নি)। আবার অন্যের মালিকানার সোনা-রুপা দখলের জন্যেও হয়েছে যুদ্ধ। ততদিনে লেখার হরফ আবিষ্কার হয়েছে, আর তা দিয়ে রাজা লিপিবদ্ধ করেছেন দাস রাষ্ট্র পরিচালন ও সম্প্রসারণের আইনকানুন। এই দাস ব্যবস্থাতেই যখন থেকে দাস-মানুষ এবং জমি-জমা বেচাকেনার পণ্যে রূপান্তরিত হলো, ঠিক তখন থেকেই শুরু "প্রকৃতির পণ্যায়ন" (commodification of nature)। যখন অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-জুলুম চরমে পৌঁছে মহাপরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে সমাজ অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত হয়—ঠিক তখনই তার পতন হয়। কিন্তু, দাস শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতনের মানে শোষণব্যবস্থার পতন নয়—নতুন এক শোষণব্যবস্থায় রূপান্তরমাত্র। দাসভিত্তিক শোষণব্যবস্থা রূপান্তরিত হয় ভূমিভিত্তিক শোষণব্যবস্থায়, যেখানে থাকেন—স্বল্পসংখ্যক ভূমিমালিক-ভূস্বামী (landlord)—আর তার অধীনে অনেকসংখ্যক কৃষক, যারা ভূস্বামীর জমি চাষ করেন (ভূমিদাস বা সার্ফ)। কৃষক-প্রজা ভূমিদাস হিসেবে খাওয়াপরাসহ ট্যাক্স (কর) দেবার বিনিময়ে ভূস্বামীর জমি চাষ করেন এবং থাকেন ভূস্বামীর কর্তৃত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পরাধীন সত্তা হয়ে। জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহের বিনিময়ে ভূমিদাস ভূস্বামীকে ভূমিখাজনা (land rent) রূপে ট্যাক্স (বা কর) থেকে শুরু করে সবধরনের নজরানাই দেন—এই সিস্টেমেরই নাম সামন্তবাদ বা ফিউডালিজম (feudalism)। দাস ব্যবস্থায় দাস ও জমি কেনাবেচা শুরু করে যেভাবে 'প্রকৃতির পণ্যায়ন' ঘটেছে, তেমনি সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ট্যাক্স বা কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঘটলো "সমাজের পণ্যায়ন" (commodification of society)। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই সিস্টেম টিকে ছিল এক-দুই হাজার বছর।

সামন্তবাদী সিস্টেম জিইয়ে রাখতে একপর্যায়ে প্রয়োজন পড়ে মহাপরাক্রমশালী 'যোগ্য' কাউকে—আর এই প্রক্রিয়াতেই আগমন ঘটে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ ও রাশিয়ার রানী ক্যাথেরিনার। সামন্তবাদী এই শোষণব্যবস্থা একদিকে জমির উর্বরতা নিশ্চিহ্ন করে, আর অন্যদিকে পরাধীন কৃষককে নিঃস্ব করে ছাড়ে। এ ব্যবস্থা টেকাতে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হয়, যা পুষতে প্রয়োজন পড়ে প্রচুর অর্থের (যে 'অর্থ' বা মুদ্রা ইতিমধ্যেই দাস ব্যবস্থাতে আবিষ্কৃত হয়েছে)—যে অর্থ জোগাড়ে আর রানীমাতাদের বিশাল অপচয় অব্যাহত রাখতে কৃষক-প্রজাদের ওপর জুলুম বাড়ে। তবে তাতেও হয়নি—অর্থ ধার করতে ধরনা দিতে হয় অর্থের মালিক—ব্যবসায়ী ও অর্থলগ্নিকারীদের কাছে। এই সুযোগে চতুর ব্যবসায়ী ও অর্থলগ্নিকারীরা "মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব" (*"Liberty-Equality-Fraternity"* বা *"Liberté-égalité-fraternité"*) স্লোগান তুলে 'বিপ্লব'-এর নামে সামন্তবাদী শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদ করে দেন। পরিণতি, ঠিক দাস ব্যবস্থার মতোই—সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটে—কিন্তু, শোষণ ব্যবস্থার পতন ঘটে না—মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ ব্যবস্থার একটা রূপভেদ ঘটেমাত্র। আর, নতুন এই শোষণ ব্যবস্থার নাম—পুঁজিবাদ (capitalism)। আমরা এখন সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই বাস করছি। এ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক গুটিকয় ব্যক্তি। পুঁজিবাদের এ প্রক্রিয়ায় গ্রামের মানুষকে তাড়িয়ে শিল্পকারখানায় আনা হয়; জোরজবরদস্তি করা হয় কারখানায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য। শোষণ-শাসন-কর্তৃত্ব-আধিপত্যের লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয় উপনিবেশ; বাজার বিস্তৃতির জন্য হয় ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিশ্বযুদ্ধ; সমরশক্তি বাড়ে; প্রয়োজন হয় মহাপরাক্রমশালী দলপতির—আবির্ভূত হয় সাম্রাজ্যবাদ (প্রথমে ব্রিটিশ, আর এখন মার্কিনি)। এই সিস্টেমে 'জুলুমবাজি' (tyranny) শুধু শারীরিক নির্যাতন-নিপীড়নে সীমাবদ্ধ না থেকে শুরু হয় কাঠামোগত জুলুম (যেমন: সম্পত্তির অধিকার)। একই সাথে চলে আইন-বিচার প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে জুলুম, যা মানুষ একপর্যায়ে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায় (যেমন, আইনের শাসন বা rule of law; বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০২০: xx-xxiii)।

মোটা দাগে, এভাবেই আর এ কারণেই "আইনের" সৃষ্টি; এবং এভাবেই এর ব্যবহার (অপব্যবহার?) হচ্ছে।

৯। ভূমি আইনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক অতি জোরালোভাবেই প্রকাশিত। রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতার (power) একটি হাতিয়ার, তাই এই হাতিয়ার ব্যবহার করে ভূমি-সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা-দখল-কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা সবসময়ই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে আইন, বেশির ভাগ সময়ই, হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর শ্রেণির রাজনৈতিক-সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। "আইন"—রাজনীতির গতিমুখ ঠিক করতে সক্ষম নয়, বরঞ্চ অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর স্বার্থরক্ষণকারী রাজনীতিই নির্ধারণ করে আইন কেমন হবে অথবা কেমন হবে না।

অর্থাৎ, ভূমির ওপর মানুষের অধিকারের নিরিখে বিষয়টি মোটা দাগে কয়েকটি প্রপঞ্চ দিয়ে দেখা সম্ভব: ভূমির অর্থনীতি; ভূমির রাজনীতি; আইনের অর্থনীতি; আইনের রাজনীতি; আইন বাস্তবায়নের অর্থনীতি, এবং আইন বাস্তবায়নের রাজনীতি।

কিন্তু এগুলোর একে অন্যের সাথে রয়েছে নানামুখী, নানামাত্রিক, নানান মাত্রায় নানান সম্পর্ক। ভূমির রাজনীতির সাথে কখনো মেলে আইনের রাজনীতি। আবার, আইনের অর্থনীতির সাথে মেলে ভূমির অর্থনীতি। এমন পারমুটেশন-কম্বিনেশনের অংক—তত্ত্বেই ঘটে। বাস্তব জীবনে এগুলো আলাদা হয়ে থাকে না, আলাদা করাও যায় না। যদি 'ভূমি আইন বাস্তবায়ন'কে একটি একক প্রপঞ্চও ধরে নিই, তাহলেও এটির রাজনীতিকে এর অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করা যাবে না। আর এসবের কোনো কিছুকেই "রাষ্ট্র" (state) নামক হাতিয়ার থেকে বিযুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ বিযুক্ত করা যাবে না "ক্ষমতা" (power) থেকে। আর শোষণভিত্তিক যেকোনো সমাজ-রাষ্ট্রে ক্ষমতা ততক্ষণ অবৈধ (illegitimate), যতক্ষণ তার বৈধতা (legitimacy) প্রমাণিত না হচ্ছে। আর ওই বৈধতা প্রমাণের দায়িত্ব (burdent of proof) সবসময় বর্তায় যারা ক্ষমতায় আছে—তাদের ওপর।

এখানেই আসে "রাজনৈতিক অর্থনীতি" (Political Economy)—শাস্ত্রগতভাবে যা অর্থনীতিশাস্ত্রসহ মানুষের জীবন-জীবিকাসংশ্লিষ্ট সম্পদের উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ সূত্র অনুসন্ধান করে।[২] এটি পরিষ্কার করে বলা ভালো যে 'ভূমি আইনের

[২] "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য নয়। তবে গ্রন্থের মর্মকথা অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে বিধায় বলে রাখা সমীচীন হবে যে অর্থনীতিশাস্ত্র (Economics)—প্রকৃতিবিজ্ঞান (natural science) নয়, তা নীতিশাস্ত্র (moral science)। আর আজকের অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবসূত্রেই নামকরণ ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি। আর যে কারণে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রধান ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রিক ও অর্থনীতিশাস্ত্রিকদের মূল গ্রন্থসমূহের শিরোনামে হয় সরাসরি "রাজনীতি" না-হয় "রাজনৈতিক অর্থনীতি" প্রত্যয় সংযুক্ত ছিল। যেমন ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম পেটির মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনাম ছিল "Political Arithmetic" (প্রকাশকাল ১৬৯০) এবং "The Political Anatomy of Ireland" (প্রকাশকাল ১৬৯১); স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট-এর গ্রন্থের শিরোনাম "An Inquiry into Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৭৬৭); ফরাসি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই-এর গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮০৩); ব্রিটিশ ধর্মযাজক এবং একই সাথে অর্থনীতি ও জনমিতিশাস্ত্রের স্বীকৃত পণ্ডিত থমাস রবার্ট ম্যালথাসের গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১০-২০ এর মধ্যে); ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর গ্রন্থের শিরোনাম "Principles of Political Economy and Taxation" (প্রকাশকাল ১৮১৭); সুইজারল্যান্ডের ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রিক লিওনার্দ সিসমন্ডির গ্রন্থের শিরোনাম "New Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১৯); ব্রিটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর গ্রন্থের শিরোনাম "Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৪৮); আর কার্ল মার্কসের গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "A Contribution to the Critique of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৫৯) এবং "Das Capital: Critique of Political Economy" (প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৭)। অর্থনীতিশাস্ত্রের উল্লেখিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ শুধু শিরোনামগতভাবেই নয় অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর নিরিখে সুস্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতি। বিংশ

রাজনীতি'র সাথে 'ভূমি আইনের অর্থনীতি'কে সরলরৈখিকভাবে যুক্ত করলে তা কোনো অর্থেই 'ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, 'অর্থনীতি + রাজনীতি' ≠ রাজনৈতিক অর্থনীতি'। এসব দেখতে হবে দ্বন্দ্বসূত্র দিয়ে।

আবার, অর্থনীতি বলতেই যেন আমরা 'চাহিদা', 'যোগান', 'মুদ্রা', 'সুদ হার', 'উপযোগ', 'ভোক্তার পছন্দ/বাছাই' —এসবের অতি সরলীকরণে পড়ে না যাই। আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে অর্থনীতির বিস্তার প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক। বড়জোর, সরলীকরণের চেষ্টা করলে আমরা একে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়াদির সাথে মেলাতে পারি—যার ব্যাপ্তিও বিস্তৃত-বহুমাত্রিক। বিশেষায়িতকরণ (specialisation) এর চক্করে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি 'খুপড়িভুক্ত' (compartmentalised-এর বাংলা যদি ধরি 'কামরাভুক্ত', তবে আমাদের সচরাচর বিচরণ এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে—বড়জোর অপরিসর এক 'খুপড়ি' ঘরে) দৃষ্টিভঙ্গিতে, আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে।

এ কথা মনে রাখা চাই যে বৃহৎ পরিসরে, বড়-পর্দায় দেখা ব্যতীত গভীরে-অতি গভীরে প্রোথিত কোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ কখনোই উন্মোচিত হয় না। আবারও মনে করাই যে, পাটিগণিতের সরল সূত্র দিয়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মেলালেই তা রাজনৈতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে না; বরঞ্চ এটি অতি শক্তিশালী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ঐতিহাসিক গতিশীল এক বিশ্লেষণ কৌশল—যা এমনকি বহিরঙ্গের মধ্যে থেকেও বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে (অর্থাৎ from "appearance" to "essence", অথবা from "form" to "content")। আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় নেমেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশে ভূমি আইন ও তা বাস্তবায়ন সমস্যা, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য দ্বন্দ্বসূত্রীয় ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী এক হাতিয়ার। এক্ষেত্রে বলে রাখা ঠিক হবে যে সামাজিক ক্রিয়াসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং বিকাশের নীতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক অর্থনীতি"র এই হাতিয়ারটি 'থিসিস', 'এ্যান্টিথিসিস' ও 'সিনথেসিস' পর্বকে তিনটি দ্বন্দ্বসূত্রের নিরিখে দেখে: (১) পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ও তার বিপরীতের নিয়ম, (২) বিপরীতের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের নিয়ম, এবং (৩) নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্র (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৯: ৩২-৪৮)।

শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাজতন্ত্রের আগমন আর পুঁজিবাদের বৈশ্বিক সংকটকাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে "রাজনীতি" প্রত্যয়টি বাদ দিয়ে শাস্ত্রের অনুসন্ধান ক্ষেত্র সংকুচিত করে তা শুধু "অর্থনীতিশাস্ত্র" নামাঙ্কিত করা হয় (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৮: পৃ. ৬৩-১১৯)। আর এসব কারণেই আধুনিক অর্থশাস্ত্রিক হ্যা-জুং চ্যাং বলছেন, "Economics is a Political argument" এবং "Political Economy: a more 'honest' name" (দেখুন, Chang 2014, pp. 401, 377)।

১০। রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ—এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু না হলেও রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা কী বুঝি—সেটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ দেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বুঝতে কেন আমরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই—সেটিই পরিষ্কার করতে চাই।

প্রথমত, রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে শোষিতের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তটুকু শোষক-শাসক যে প্রক্রিয়ায় দখল করে, কব্জা করে, নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনা করে এবং সর্বোপরি আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেই পথ-পদ্ধতিটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা ব্যবহার করে শোষক কায়েম রাখে তার ক্ষমতা এবং শাসনব্যবস্থা।

আমাদের প্রেক্ষিতে (শুধু আমাদের বলি কেন, বিশ্বের নানান প্রান্তে—নানান চেহারায়, নানান মাত্রায় একই বিষয় বিদ্যমান), ভূমিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রাপ্তি (কোনো অর্থেই শুধু ফসল নয়) তার উদ্বৃত্ত কীভাবে শাসক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মসাৎ করে, তা তাত্ত্বিকভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির উপজীব্য একটি বিষয়। বলা ভালো, রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি 'ক্ল্যাসিক' উদাহরণ এটি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 'আইন' আসছে কোথা থেকে? উত্তরটা সরল। যদিও তার পূর্বাপর মোটেও সরল নয়। আমাদের অনুধ্যানে 'আইন' এখানে হাতিয়ার মাত্র, যা পূর্বেই উল্লেখিত শাসক শ্রেণির পক্ষে আত্মসাৎ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে—একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ, 'আইন' এবং তার 'বাস্তবায়ন' (বাস্তবায়ন নিজেও কিন্তু একটি আইনি বিষয়) এমন এক 'জাদুকরি' (মন্দ-জাদু বলাই ভালো) হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে যা শাসিত বা শোষিত শ্রেণির ভূমিনির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু রীতিমতো ঘটা করে শাসক বা শোষকের আত্মসাৎ উপযোগী করে তার পাতে তুলে দেয়। এখানে উৎপাদন পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক কৌশল যা-ই থাকুক না কেনো—দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি, সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ, অথবা এসবের মিশ্র কোনো হাইব্রিড—আইন এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির 'সুফল' (পড়তে হবে, আত্মসাৎকৃত অন্যায্য উদ্বৃত্ত) কোনো একটি 'শ্রেণি'-ই পায়, সবাই পায় না—আইন এবং তার বাস্তবায়ন কাজ করে অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে, শাসক বা শোষকের স্বার্থ রক্ষাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

যতক্ষণ না, শাসক এবং শাসিত একই সত্ত্বা হচ্ছেন অর্থাৎ, "শাসক = শাসিত" না হচ্ছে, অথবা শোষিত মানুষের স্ব-শাসন কায়েম না হচ্ছে, অথবা নিদেনপক্ষে 'প্রায়' সমান (শাসক $\cong$ শাসিত) না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন এবং তার বাস্তবায়ন শুধু শাসক বা শোষক শ্রেণির স্বার্থ সাধনে বিরাজমান থাকবে—আইনের দেবী থেমিসের

সাধ্য নেই যে নিজের চোখ বেঁধে সবাইকে একই দাঁড়িপাল্লায় মাপবেন; শাসিত বা শোষিত শ্রেণি ওজনে বরাবরই কম পাবেন, কিংবা পাবেনই না আদৌ, অথবা পেলেও শাসক বা শোষকের ছড়িয়ে দেয়া খুদকুঁড়োটুকু পেয়েই খুশি থাকতে হবে—যাকে আবার অনেকেই 'ট্রিকেলডাউন ইফেক্ট'-এর সুফল ভেবে আত্মতৃপ্ত থাকতে চান। এখানে শাসিত বা শোষিত শ্রেণির 'অধিকার'-এর বিষয়টি বাতুলতা, কারণ দুটো অসম সত্তার মধ্যে সম-অধিকার নিয়ে আলোচনা যুক্তিহীন।

এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো: যেখানে 'শাসক = শাসিত' হওয়াটাই আদর্শ অবস্থা, সেখানে আমরা কেন শাসক এবং শাসিতের 'প্রায় সমান ($\cong$)' অবস্থার কথাও বললাম? এর উত্তর একটু পর দেব। তবে একটা শক্তিশালী উত্তর হতে পারে যেমনটি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৮/৪২৭-৩৪৭) বলেছিলেন, "There should exist among citizens neither extreme poverty nor again excessive wealth, for both are productive of great evil."।

এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায়, আর সব ক্ষেত্রের মতোই, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন ঐতিহাসিকভাবেই এমন করেই হয়ে আসছে যেন 'শাসিত' কখনোই 'শাসক'-এর সমান তো দূরের কথা কাছাকাছিও হয়ে উঠতে না পারে। বরঞ্চ "আইন" এবং "আইনের বাস্তবায়ন" এমনভাবেই হয় যেন ওই উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে শাসকের কোনোই বেগ না পেতে হয়; কোনো দিক থেকে কোনোরকম বাধা আসবার সব সম্ভাবনাকেই বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি ব্যবহারে রুদ্ধ করা হয়। বড়জোর 'সিভিল সোসাইটি'র নাম দিয়ে এক-আধটু রঙিন আশার পতাকা সামনে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয় শাসকের দিক থেকেই—তাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই ইন্ধনই থাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব 'বড় বড় নীতিনির্ধারক'দের দিক থেকে। অর্থাৎ, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি—চিরে দেখছি এর ভেতর-বাহির, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবেই এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অর্থনীতির এক 'প্র্যাক্টিকাল ক্লাস'।

১১। রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শাসকগোষ্ঠীর দরকার 'আইন'। তবে ভূমি আইনসহ সবধরনের আইন এবং সেসবের প্রয়োগকাঠামো ও বাস্তবায়ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেমন হবে, তা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট সময়ে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নিয়ামক বৈশিষ্ট্যের ওপর। তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন—আমাদের দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটি কেমন? আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে যে নামে আখ্যায়িত করা চলে তা হলো—"রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কতিপয়তন্ত্রের আধিপত্য" (Dominance of criminalised oligarchs regulated by rent-seekers)।

যেহেতু এ গ্রন্থে 'রেন্ট-সিকার' প্রপঞ্চ বা ধারণাটি অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু ধারণাটির মর্মার্থ বলা দরকার। 'রেন্ট-সিকার'-এর (rent-seeker) মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাউখাওয়া শ্রেণি, ফাটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি।

রেন্টসিকিং বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এ রকম: বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে—এটি 'রেন্টসিকিং' নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই রেন্টসিকিং। আর এসবের সাথে যুক্ত যারা, তারাই রেন্ট-সিকার। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায়, সেখানে রেন্টসিকিং-এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। রেন্টসিকিং সমাজের মোট বিত্ত কমায়, এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। রেন্টসিকিং পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচু তলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ, আর নিচু তলার মানুষের দুর্দশার উৎস—বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। রেন্টসিকিং-এর এই পদ্ধতি প্রয়োগে রেন্ট-সিকার হয়ে ওঠেন আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির মালিক (owner of financialised capital)—যে পুঁজির মাধ্যমে তারা সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র সবকিছুরই একচ্ছত্র কর্তৃত্বকারী-নিয়ন্ত্রক বনে যান।

রেন্টসিকিং পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবেন, কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবেন না—কীভাবে কী হয়ে গেল! আর রেন্টসিকিং-এর এই প্রক্রিয়ায় রেন্ট-সিকারদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে, যা দুর্ভেদ্য—যে ত্রিভুজটি বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন-নিয়ম-বিধি প্রয়োগ করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। রেন্টসিকিং-এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়—এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market) অন্য সবার জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্ব মহামন্দা আর ২০০৭-০৮-এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত তত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস

করেন কি-না সন্দেহ—'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য। আর এখনকার নব্য-উদারবাদ হলো এই 'অদৃশ্য হাত'-এর দৃশ্যমান তত্ত্ব।

এখন বাজারব্যবস্থাটাই এমন—যা রেন্টসিকিং সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে—রেন্টসিকিং সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; রেন্টসিকিং অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা বাড়াবে। আর ওই অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে—রেন্টসিকিং-উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে। আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে। আর পুরো এই প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৭: ২৩-৩৪)। রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে অনেক হাতিয়ার ব্যবহার করে, যার অন্যতম হলো: নিয়মনীতি প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে এমনভাবে কব্জায় নিয়ে আসে, যাতে করে বাজারের খেলায় তারাই খেলোয়াড় এবং একইসাথে তারাই রেফারি অথবা আম্পায়ারের নিয়োগদাতা।

রেন্ট-সিকাররা এমনই শক্তিমান যে তারা ক্ষমতাকে (power) রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বনে যান। আর এসবের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম যে—আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালায় যাই-ই লেখা থাকুক না কেন—সেসব শেষপর্যন্ত রেন্টসিকারদের স্বার্থ হাসিলে বাধ্য। অর্থাৎ আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির বাহক রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কতিপয়তন্ত্রের আধিপত্য বজায় রেখে আইন-কানুনের কিছু গণমুখী-দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য কল্যাণউদ্দিষ্ট সংস্কার (reform) অথবা তথাকথিত সুশাসন (good governance) শেষপর্যন্ত কাজ করবে না—কাঠামোগত কারণেই। আর অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এই কাঠামোগত কারণেই এখানে চিরস্থায়ী হবে "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" ("culture of injustice"; বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৫ খ: ২৬-৫৪)।

১২। আমাদের দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা রেন্টসিকার ও দুর্বৃত্তায়িত। সুতরাং এ কথা আমাদের জানাই ছিল—বাংলাদেশের ভূমি আইন দরিদ্র বান্ধব নয়; নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীর ভূমি অধিকার রক্ষায় কার্যকর। জমি-জলা-জঙ্গলে যাদের অধিকার নিশ্চিত হবার কথা ছিলো সর্বাগ্রে, সেই জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষ এই পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্যজন—সর্বার্থেই অপাঙ্‌ক্তেয়, কৌলিন্যহীন। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো—কোথাও তাদের ঠাঁই নেই। বরঞ্চ তাদের উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাতের 'কারেন্ট জাল' বেছানো সর্বত্র—জাল ছিঁড়ে বেরোনোর কোনোই উপায় নেই।

ভূমি আইনের সমস্যা অগুনতি। আইনে রয়েছে অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, সাংঘর্ষিকতা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতির ওই তত্ত্বমতেই যেন, পুরো আত্মসাৎ-প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেবার এক অন্যতম ক্রীড়নক—হলো ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন। তাই, যেকোন বিচারেই, ভূমি আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'-এর লেন্স—সর্বোতভাবেই কার্যকর এক লেন্স। আর, অন্যান্য গবেষণা—যার অনেককটিই এই গ্রন্থের লেখকদেরই করা—এটা নিশ্চিত করেই দিয়েছে যে: আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে অনুপস্থিত।

আর যদি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের প্রসঙ্গগুলো টানি—তাহলে, এটি নগ্নভাবেই দৃশ্যমান যে এই অতি জরুরি বিষয়গুলো আইনগুলোতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত নয়। আর এটাও বলা ভালো যে আইনের এইসব দুর্বলতা কিন্তু কোনো 'মানবিক ভুল' (human error) নয়—এটি ইচ্ছাকৃত, দুরভিসন্ধিমূলক এবং এমনভাবেই করা যেন, সকল নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শাসিত সমাজের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু বিনা বাধায় আত্মসাৎ করা যায় ।

খাসজমি—যা এমনকি দেশের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য—তা তারা পান না, পেলেও ধরে রাখতে পারেন না। এসব সংশ্লিষ্ট আইনি দলিল—খাসজমিতে, তা সে কৃষি কিংবা অকৃষি থেকে, 'অধিকারহীন'-এর অধিকার নিশ্চিত করে না মোটেও। আইন বাস্তবায়ন—অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা, বন্দোবস্ত এবং ধরে রাখবার (retention) উপায়—এমনভাবেই বিনির্মিত হয় যে সেখানে দরিদ্র-ভূমিহীন মানুষের কার্যকর কোনো অংশগ্রহণ থাকে না; বলা ভালো, থাকতে দেয়া হয় না। যারা বন্দোবস্ত পানও কপালগুণে, তাদের সেই বহু আরাধ্য জমিটুকুর দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়েও অনুপস্থিত একটি কার্যকর নির্দেশনা। এ ছাড়াও, শ্রেণিকাঠামোর গড়নটিই এমন যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিটুকু ধরে রাখবারও কোনো উপায় খুঁজে পান না শ্রেণিকাঠামোর মইয়ের 'নিচের ধাপের' মানুষ। আইন এবং তার ব্যবস্থাপনা কাঠামোটিই এমন যে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহকগণ (যারা শাসক/শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই করেন মূলত) পুরো প্রক্রিয়াটিকেই করে তোলে স্বেচ্ছাচারমূলক—যেখানে স্পষ্ট হয়ে থাকে অধিকার, ক্ষমতা, এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা। অথচ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বলে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য" [অনুচ্ছেদ ২১ (২)]। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে যারা বরাদ্দ পান, তাদের জন্যও ওই বরাদ্দপ্রাপ্ত খাসজমি অধিকারে রাখবার ন্যূনতম

কোনো ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। খাসজমি—কৃষি এবং অকৃষি দুই ক্ষেত্রেই—ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই শাসক শ্রেণির দ্বারা (by) এবং শাসক শ্রেণির জন্যই (for)।

"জাল যার জলা তার"—এই ন্যায্য নীতির কোনোই বাস্তবায়ন দেখা যায় না সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ১৭ কোটি মানুষের এ দেশে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা জলাকেন্দ্রিক, অথচ এর দুই-তৃতীয়াংশ বাস করতে বাধ্য হন বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে—যার শুরুটা হয় মন্দ আইন এবং সেই মন্দ আইনের মন্দতর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। জলমহালসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলকে আপাতদৃষ্টিতে মৎস্যজীবীদের জন্য অনুকূল মনে হতে পারে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন—যা আইনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এমনই, যে তা অতি 'সতর্ক'ভাবে এই মৎস্যজীবীদের 'বহিঃস্থ' করে রাখে। প্রবেশ করে 'মৎস্যজীবী' পরিচয়ে 'ক্ষমতাশালী মৎস্যজীবী'রা—তারাই শাসক, তারাই লুটেরা। নারী? সে তো পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্য—ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাহীন (নারীর ক্ষমতাহীনতার বহুমাত্রিকতা এবং গভীরতা সম্পর্কে দেখুন, বারকাত ২০২০: পৃ. ৩৮৮-৪১২)।

"অধিগ্রহণ' হলো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। অন্যদিকে, 'হুকুমদখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ। আমাদের এই দেশে—যেখানে জনঘনত্ব অত্যধিক এবং কৃষি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত সামাজিক-মইয়ের নিচের দিকের মানুষের জন্য—স্বভাবতই, 'অধিগ্রহণ' এবং 'হুকুমদখল ভূমি ডিসকোর্সে অতীব দরকারি। এ জন্য আইন আছে । কিন্তু, এই আইনে উল্লেখই হয়নি 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'-এর মতো দরকারি সব আইনি শব্দের সংজ্ঞা। অন্তর্ভুক্ত হয়নি 'পুনর্বন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থ-সামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদির মতো বিষয়। ক্ষতিপূরণ মানেই আর্থিক (financial), অ-আর্থিক (non-financial)-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়ে এই আইন নিশ্চুপ। অধিগ্রহণের ফলে যে ব্যক্তি স্থানচ্যুতিতে বাধ্য হন, সেই স্থানচ্যুতির আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর ব্যত্যয় ঘটানোই যেন রীতি। ধনীরা ক্ষতিপূরণ পান দ্রুত, দরিদ্রদের ঘুরতে হয় দিনের পর দিন—তারপরও যদি কিছু পান, তার পরিমাণও হয় নগণ্য। হুকুমদখলের ক্ষেত্রে আইনে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হয়। কিন্তু, বাস্তবে সেসব মানদণ্ড ক্ষমতাসীনের পক্ষেই যায় শুধু। বিশেষ করে ওই জমির মালিক যদি হন দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী-আদিবাসী-প্রতিবন্ধী—তবে তো তার কণ্ঠ অশ্রুতই থেকে যায়।

আমাদের এই দেশে "জমি ব্যবহার" (land use) হয় যার-যার ইচ্ছেমতো—না, বলা ভালো যে কাজটি হয় শাসকের ইচ্ছেমতো। ফলে কমে কৃষি জমি, কমে জলা, বাড়ে ভূমিহীন কৃষক-জলাজীবী মানুষ। বাড়ে দারিদ্র্য, বাড়ে প্রান্তিকতা। পরিবেশ অমূল্য।

অথচ আমাদের ভূমির ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে, এমনভাবেই হচ্ছে যে পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে—যার ফল ভোগ করতে হবে বংশপরম্পরায়। আইনি দলিল একটা আছে বটে, কিন্তু তা কাগজেই। রাষ্ট্রের যেখানে দায়িত্ব ছিল তার জনগণের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং অধিকার নিশ্চিত করা—সেখানে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হবার 'রকেট গতির প্রতিযোগিতা'য় প্রতিনিয়ত ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে বর্তমানসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

অর্থাৎ, ভূমি আইন ব্যবহারের যে ধারা ও পদ্ধতি, তা, আমরা যে দরিদ্র ও অ-ক্ষমতা উৎপাদনকারী এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের কথা বলছি, সেটাকেই পোক্ত করে—রাজনীতি সেখানে শোষকের পক্ষের একটি অস্ত্রমাত্র, আর কিছু নয়। ক্ষমতায়, যে—যে নীতি নিয়েই আসুন না কেন, তা বরাবরই একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতেই তৎপর; বাকিদের স্বার্থ ঠিক ততটুকু রক্ষা করা হয়, যতটুকু না করলে শাসিত শ্রেণি ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তটুকু উৎপাদনের ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলবে।

১৩। জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান নিয়ে সরাসরি-সোজাসাপটা একটা প্রশ্ন করাই যেতে পারে। প্রশ্নটি এ রকম: ওইসব আইন-কানুনের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না—যখন "আইন" যাদের জীবনমান-উন্নয়নের জন্য প্রণীত বলে বলা হয় তারা তার কিছুই জানেন না, জানবেন না, তাদের তা জানানোও হবে না। আসলে এভাবেই সৃষ্টি হয় দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ মানুষের মধ্যে "নীরবতার সংস্কৃতি" (culture of silence), যা ধনী-রেন্টসিকারদের অস্তিত্বকে সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বলে দৃশ্যমান করে। শোষণভিত্তিক সমাজে "আইন-কানুন-রীতি-নীতি"কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ এমনভাবে হাজির করা হয় যে খুবই সচেতন ও সংগঠিত না-হওয়া পর্যন্ত দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ "নীরবতার সংস্কৃতি" ভাঙার কথা ভাবতেই পারেন না। মনোবিজ্ঞানী আইভান পাভলভের ভাষায়, এসব হলো আইন-কানুন-রীতি-নীতি সৃষ্টি করে জনগোষ্ঠীর "আচরণ পরিবর্তন" বা "মগজ ধোলাই" বা "জোর-জবরদস্তি করে মানতে বাধ্য করা" (coercive pursuasion)।

এ প্রশ্ন তো যে কোনো বিচারে অত্যন্ত যৌক্তিক যে, সে আইনের কী প্রয়োজন যা যাদের জন্য প্রণীত তা তাদের জানানো হবে না অথবা আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—না জানানোটাই এক আইন-রীতি। তবে যেকোনো আইনের যা যা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষকে ভালোভাবে জানানো হয়ে থাকে এবং হবে তা হলো 'শাস্তির আইন'। তাহলে নৈতিক দৃষ্টিতে ওইসব আইনই তো নীতিগর্হিত বিধায় বেআইনি। ওইসব আইন পুরো বিষয়ে শাসক শ্রেণি ও ক্ষমতাকাঠামোর প্রকৃত স্বার্থ গোপন রাখে; আর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের ব্যাপারে শুধু উদাসীনই নয় বিরোধাত্মকও। সুতরাং সে আইনের কী প্রয়োজন যা কৃষিজীবী ভূমিহীন মানুষকে জমি, জলজীবী জলাহীন মানুষকে জল-জলা, আর বনজীবী বন-জঙ্গলের মানুষকে

বন-জঙ্গলে মালিকানা দেবার কথা বলে কিন্তু আইনটিই তাদের জানতে দেয় না এবং কী করলে কোথায় গেলে ওইসব দরিদ্র মানুষ তাদের ন্যায্য হিস্যা পাবেন সে বিষয়ে তাদের কার্যত অজ্ঞ রাখে। যুক্তির নিরিখে এসব আইন এবং আইনি প্রতিষ্ঠানের তো কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইন তো বাস্তবে অস্তিত্বমান, আর বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানও তো বাস্তবে বিরাজমান। আর এসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে রাষ্ট্র-সরকারকে তো অনেক অর্থ-সম্পদ-সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসব ব্যয়ভার বহন করেন জনগণ—ট্যাক্সের টাকা-পয়সায়; আর এসবের ফলে শেষপর্যন্ত জনগণ 'ট্যাক্স দাসত্বের' (tax slavery) মারপ্যাঁচে পড়েন। তাহলে দাঁড়ালোটা কী?

শাসক শ্রেণি-ক্ষমতাবাহকেরা বলেন যে জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রবিধি, নীতিমালা—এসবই প্রণয়ন করা হয় রাষ্ট্র-সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনের জন্য। মানুষের মঙ্গলের লক্ষ্যে। প্রচার-প্রপাগান্ডাসহ বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঘটা করে বলা হয় যে এসব আইন-কানুন তো দরিদ্র-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের মঙ্গল-বিবেচনা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়। এসবই আপাতদৃষ্টে সত্য বলে মনে হয়—কিন্তু প্রকৃত অর্থে মিথ্যা। কারণ, আইন যদি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের মঙ্গল চিন্তা থেকেই প্রণীত হয়ে থাকে, তাহলে তা তাদের পুরোপুরি জানানো হয় না কেন? এসব থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে একটা সোজাসাপটা সুপারিশ করাই যেতে পারে: দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষকে খাস জমি-জলা দেবার দরকার নেই। কিন্তু, দেবার জন্য যে আইন আছে তা তাদের বিস্তারিত জানানো হোক এবং এসবের সাথে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সংযোগ বলা হোক।

আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো—সবই তো শ্রমজীবী দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের টাকা-পয়সা দিয়েই করা হয়, কিন্তু এসব তাদের সামনে স্বচ্ছ-স্পষ্ট করা হয় না, সেইসাথে বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সালাম-সেলামি না দিয়ে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকারও থাকে না। সত্যনিষ্ঠ-ন্যায়ভিত্তিক যেকোনো মানদণ্ডে এসব আইনের তো কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব আইন আছে এবং সম্ভবত দীর্ঘকাল থাকবে।

এসব আইন ততকাল থাকবে, যতকাল যাদের কথা ভাঙিয়ে এসব আইন-কানুন প্রণীত হয়েছে তারা এসবের ফাঁকফোকর বুঝবেন না, বুঝতে দেয়া হবে না, অর্থাৎ জন রাউলসের "ন্যায্যতার তত্ত্বের" ভাষায়—যতক্ষণ দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষকে "অজ্ঞতার বোরখা" (veils of ignorance) পরিয়ে রাখা হবে। আসলে দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ মানুষকে আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালা—এসব না বুঝতে দেয়াটাই আইনবিষয়ক প্রচার-প্রপাগান্ডার মুখ্য বিষয়। কিন্তু যখনই দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ ব্রাত্যজন ওইসব ফাঁকফোকর বুঝে "অজ্ঞতার ঘোমটা" থেকে বেরিয়ে ওইসবের বিরুদ্ধে সংগঠিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা

উল্টে দিয়ে নিজেদের জন্য ন্যায্য-ন্যায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, তখন আর এখনকার এসব আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালার অস্তিত্ব থাকবে না। তখন দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষবিরুদ্ধ এবং ধনী-রেন্টসিকার-লুটেরা-পরজীবী শ্রেণির স্বার্থোদ্ধারউদ্দিষ্ট জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট এসব আইনই শুধু নয়, আইন বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহও ভেঙে পড়বে। এসবই হলো সমাজপরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতির ভেতরের কথা।

১৪। অতীতেও আমাদের শোনানো হয়েছে। এখন আরো বেশি বেশি শোনানো হচ্ছে। কথাটি এ রকম: বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান প্রয়োগে আইন-কানুন এখন গণমানুষের কল্যাণউদ্দিষ্ট করা হচ্ছে। 'ডিজিটাল' বিষয়টি অধুনা জনপ্রিয়—যদিও ১৯৬০-এর দশকে "প্রযুক্তিগত নির্ধারকতাবাদ" (technological determinism) নামক কাল্পনিক জগাখিচুড়ি তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে (দেখুন, বারকাত ২০১৯: ২৯-৩১)। ভাবখানা এ রকম যে জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট সব আইনকানুন-বিধি প্রবিধি-নীতিমালা—সবকিছু 'ডিজিটাল' করলেই দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের সব স্বার্থ উদ্ধার হয়ে যাবে। এসব অনেকটা "মাথাপিছু আয়"-এর ধোঁকাবাজ গল্পের মতো যে—যেহেতু মাথাপিছু আয় জনগণের মাথার পেছনের দিকে থাকে সেহেতু তা দেখা যায় না!

মূল কথা হলো সামাজিক স্বার্থবিযুক্ত ও সমাজবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি (তা ডিজিটাল অথবা অ্যানালগ—যে রকমই হোক না কেনো) বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। আর যদি থেকেই থাকে তাহলে তা শেষপর্যন্ত সংখ্যাস্বল্প শাসকগোষ্ঠী-ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার থেকে শুরু করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ শ্রেণিস্বার্থনিরপেক্ষ নয়। কথা হলো যেখানে ৮০ শতাংশ মানুষ প্রকৃতির সম্পদ জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট উৎপাদন উপায়ের মালিকই নন, সেখানে এসবের স্বার্থসম্পর্কিত আইন-কানুন-বিধি-বিধানগত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাপজোখ থেকে শুরু করে ভূমি ব্যবহার নীতি কার স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য তা নিরূপণে গবেষক হবার প্রয়োজন পড়ে না।

বিদ্যমান অন্যায্য আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের আইন হবে—আইন হবে জমি-জমার মালিকানা একক দলিলভুক্ত করার। কিন্তু এমন কোনো আইন ভুলক্রমেও হবে না যা দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে প্রকৃত খাস জমি-জলার পরিমাণ ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক নিরূপণ করে তা প্রকাশ করা হবে; এমন কোনো আইন হবে না যা দিয়ে প্রশাসন বাধ্য থাকবে দেখাতে যে কোন গ্রামে বা শহরে কোন ব্যক্তি-পরিবার কতটুকু খাসজমি-জলা পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন এবং কোন সময়ে, কোথায় তেমন কোনো ধরনের হেনস্তা ছাড়াই তিনি/তারা ওইসব পেয়ে যাবেন। বিরাজমান কাঠামোতে যা হওয়া সম্ভব এবং হবে তা হলো বিজ্ঞানসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার হবে প্রধানত বিদ্যমান কাঠামোকে জিইয়ে রাখতে এবং সে কারণেই জমি-

জলা-বনদস্যুদের স্বার্থোদ্ধার ত্বরান্বয়ন ও নির্বিঘ্নকরণ করতে। এসবে লাভ যারই হোক না কেন, কোনো লাভ হবে না দরিদ্র-ভূমিহীন-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের। তবে অধিকার যেহেতু দয়াদাক্ষিণ্যের নয়, আদায়ের বিষয়; সেহেতু অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলন হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

১৫। এই গ্রন্থে আমরা কৃষি-জমি-জলাসংক্রান্ত বেশকিছু "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন" নিয়ে আমাদের গবেষণাফল উত্থাপন করেছি। বলে রাখা দরকার যে "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন" বিষয়সমূহ প্রধানত গুণগত (primarily qualitative) বিষয় পরিমাণগত (quantitative) নয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর এ কথা আমরা সম্যক অবগত যে, "কোনো ভালো সিদ্ধান্তের ভিত্তি—সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে নির্ধারণ সম্ভব নয়, তা জ্ঞান দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে"। এ সত্ত্বেও আমাদের গবেষণাফল তুলনামূলক সহজবোধ্য, প্রয়োজনীয় ও উপযোগসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সামাজিক গবেষণায় রাজনৈতিক অর্থনীতির পদ্ধতিতত্ত্ব প্রয়োগসহ একটা 'নতুন দিগন্ত' (New horizon in social research) উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি। ওই নতুন দিগন্তটি হলো আইনসংশ্লিষ্ট গুণগত বিষয়াদিকে পরিমাণ দিয়ে দেখানোর প্রয়াস। বিষয়টি সহজও নয় সরলীকৃতও নয়। তবে বলে রাখা দরকার যে আইন বিষয়ের সংখ্যাবাচক পরিমাণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যথামাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

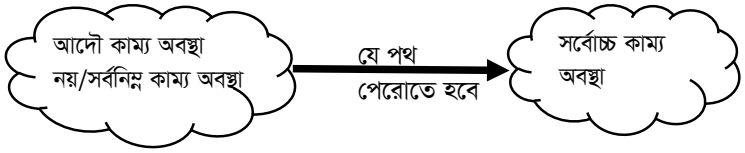
আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ যাই-ই হোক না কেন (শোষণউদ্দিষ্ট কি-না তা এখানে মুখ্য বিষয় নয়) 'আইন' (ধারা-উপধারায় বিবৃত বিষয়বস্তু ও ভাষা) ও তার 'বাস্তবায়ন'সংশ্লিষ্ট গুণগত বিষয়াদিকে সংখ্যাবাচক পরিমাণগত পরিমাপ করে বোঝা সম্ভব যে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের ভাবনা ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতার নিরিখে এসবের দূরত্ব—আদর্শ অবস্থা (ideal state/situation) অথবা 'কাম্য অবস্থা' (expected state/situation) (যা নিঃসন্দেহে নর্মাটিভ অর্থাৎ উচিত/অনুচিতসংশ্লিষ্ট) থেকে কতটুকু (কত দূর) এবং ওই দূরত্বকে 'কাম্য-কাঙ্ক্ষিত-আদর্শ' দূরত্বে আনার পথ-পদ্ধতি কী হতে পারে। বিষয়টি বাস্তব-প্রায়োগিক বিবেচনায় গুরত্ববহ।

'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন' (অথবা 'বাস্তবায়ন অবস্থা')—এ দুয়ের পরিমাণগত স্কোর-মান (quantitative score value) দিয়ে একদিকে যেমন অনেক কিছুই অনুধাবন সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে বাস্তব-প্রায়োগিক করণীয়ও নির্ধারণ এবং তা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্ভব। সহজভাবে বিষয়টি এ রকম: দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক মানুষের 'অধিকার' (right)-এর নিরিখে সবচে বেশি 'কাম্য' (সবচেয়ে ভালো) অবস্থা হতে পারে তখন, যখন 'আইন' হবে "আদর্শ অবস্থার কাছাকাছি" আর একই সাথে "আইনের বাস্তবায়ন অবস্থা" হবে তারই কাছাকাছি (অর্থাৎ এ দুয়ের দূরত্ব হবে খুব কম); আর "আদৌ কাম্য হবে না" (অর্থাৎ সবচেয়ে মন্দ/খারাপ) সে অবস্থা, যা হবে উপরের ঠিক উল্টো অথবা বিপরীত অর্থাৎ 'আইন'

হবে "আদর্শ অবস্থার অনেক-অনেক পেছনে" এবং একই সাথে "আইনের বাস্তবায়ন" অবস্থাও হবে অনুরূপ "অনেক-অনেক পেছনে"; আর "মোটামুটি কাম্য অবস্থা" হবে তখন, যখন 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' অবস্থা—দুটোই হবে মধ্যম গোছের, মাঝামাঝি (ছক ১ দেখুন)। 'আইন' ও 'আইন বাস্তবায়ন' ভাবনার এ ধরনের ছক বলে যে, যদি কেউ (ব্যক্তি-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান) 'আইন' এবং তার 'বাস্তবায়ন' অবস্থা তুলনামূলক অধিকতর 'অধিকারমুখী' করতে ইচ্ছুক হন—সেক্ষেত্রে তাকে 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' উভয়কেই নিচের দিক থেকে উপরের দিকে নিতে হবে অর্থাৎ 'পেছন' থেকে "আদর্শ কাম্য" অবস্থার কাছাকাছি নিতে উদ্যোগী হতে হবে। 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন'-এর স্কোর-মানভিত্তিক এ ভাবনাটি বাস্তব-প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগুরু মানুষের জন্য ফলপ্রদ হতে পারে। যেমন—কৃষিজীবী-জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী শ্রমজীবী মানুষ, তাদের সংগঠন, গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাপ্রণেতা, অধিকার আন্দোলনকারী, বেসরকারি সংস্থা, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী, বিভিন্ন নাগরিক সমাজসহ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদি।

ছক ১: স্কোরিং-মান দিয়ে 'আইন' ও 'আইনের বাস্তবায়ন' অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকাঠামো

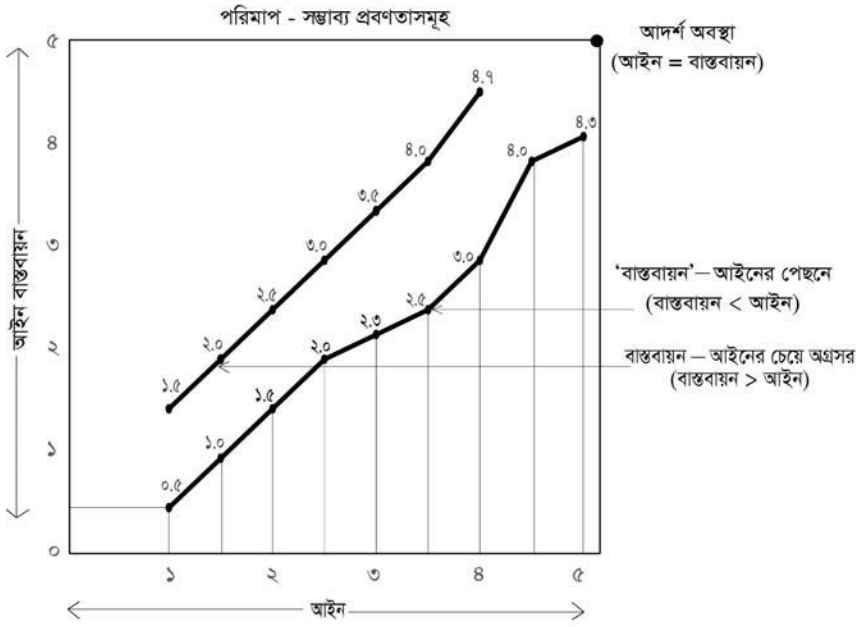
বিদ্যমান 'আইন': 'আদর্শ'/কাম্য/কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে দূরত্ব	পেছনে	মাঝামাঝি	কাছাকাছি
'আইনের বাস্তবায়ন': বিদ্যমান 'আইন' থেকে দূরত্ব	পেছনে	মাঝামাঝি	কাছাকাছি



প্রচলিত আইনশাস্ত্রে 'আইন' ও 'আইন-বাস্তবায়ন' অবস্থার পরিমাণগত পরিমাপ খুব একটা করা হয় বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিমাপবিজ্ঞানের বিকাশ এসবের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব বাড়াবে। যতই ইচ্ছানির্ভর (subjective) হোক না কেন আইনের মর্মবস্তুর পরিমাপ করা হবে বহুমাত্রিক গুরুত্ববহ। আমরা আগেই বলেছি 'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন'—এসব তার আদর্শবিন্দু অথবা কাম্যবিন্দু থেকে কত পেছনে অবস্থান করছে তা জানার সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। আমাদের গবেষণায় এসব নিরূপণের চেষ্টাও করেছি। 'আইন' এবং 'আইন বাস্তবায়ন'সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পরিমাপ উভয়েরই শ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এ প্রশ্ন যথেষ্ট প্রায়োগিক মূল্যসম্পন্ন যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 'আইন বাস্তবায়নের' এক একক উন্নতি-উৎকর্ষ 'আইন' পরিবর্তনে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে অথবা 'আইন'-এর এক একক উন্নতি-উৎকর্ষ 'আইন বাস্তবায়নে'

কতটুকু প্রভাব ফেলতে সক্ষম? লেখচিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে যে 'আইন' ও (সেই) "আইনের বাস্তবায়ন" স্বাভাবিক রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থায় কোন ধরনের প্যাটার্ন (pattern under general situation) অনুসরণ করে থাকে, আর রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্তিত হতে থাকলে ওই প্যাটার্নের কেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্যাটার্নটা হয় এ রকম যখন 'আইন' জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রণীত নয় বিধায় জনস্বার্থের মানদণ্ডে পশ্চাৎপদ (পেছনে থাকে) আর 'বাস্তবায়ন' স্বাভাবিকভাবেই তার থেকে পেছনে-অনেক পেছনে থাকে (লেখচিত্র ১-এর ভূমি অক্ষের শুরুর দিক); আর অবস্থা বিপরীতমুখী হলে 'আইন' ও তার 'বাস্তবায়ন'—উভয়ই অনেক সামনে এগিয়ে যায় (লেখচিত্র ১-এর ভূমি অক্ষের শেষের দিক অর্থাৎ নিচের রেখচিত্রের মতো)। আবার এমনও হতে পারে—যা স্বাভাবিক নয়—যখন আইনের বাস্তবায়ন স্বাভাবিক প্রবণতাকে অতিক্রম করে। যেমন যদি কোনো এলাকা-অঞ্চল-দেশে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকেরা সংগঠিত আন্দোলন-সংগ্রাম করে প্রচলিত আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে খাস জমি-জলা-জঙ্গলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলে; এসবের অনুকূল 'আইন' পরেও প্রণীত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রবণতাটা হবে লেখচিত্র ১-এর উপরের দিকের রেখচিত্রের মতো।

লেখচিত্র ১: "আইন" ও "আইন বাস্তবায়ন"-এর পরিমাপ - সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহ



১৬। "আইন" থাকলে "মামলা" হবে—এটা রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত বাজার অর্থনীতিতে স্বাভাবিক। আর জমি-জমার ক্ষেত্রে এটা ধ্রুবসত্য। ভূমি নিয়ে মামলা-

মোকাদ্দমা-বিবাদ ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য-অধীনস্থ বিষয়। কিন্তু "ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি"সংশ্লিষ্ট একাডেমিক সাহিত্যে এসব এখনো পর্যন্ত স্বল্পগবেষিত বিষয়।

রেন্টসিকিংভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখারও অন্যতম মাধ্যম ভূমি মামলা। ভূমি মামলা আসলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ (anti-nature) বিষয়। কারণ 'সভ্য' মানুষ, যা সৃষ্টি করতে পারে না, তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা দাবি করে কী যুক্তিতে, মামলা তো অনেক দূরের কথা। ভূমি মামলার পুরো বিষয়টি পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণা দেখায় যে, ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাত্রা নিম্নরূপ: (১) এ দেশে মামলার দুই পক্ষ—বাদী ও বিবাদী, তাদের পরিবারের সদস্য-সাক্ষীসহ ভূমি মামলার সাথে সম্পর্কিত মোট মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, এ দেশে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষ ভূমি মামলায় জড়িত; কেউ কেউ আসলে একাধিক মামলায় জড়িত)। (২) বছরে ভূমিকেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লক্ষ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭ শতাংশ। (৩) এ মুহূর্তে যেসব ভূমি মামলার রায় অপেক্ষমাণ, সেসব মামলায় বাদী-বিবাদী মিলে মোট ভোগান্তিবর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লক্ষ বছর। (৪) দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লক্ষ একর, যা ক্রমপুঞ্জীভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। (৫) ভূমি নিয়ে প্রতিবছর যেসব মামলা হচ্ছে, ওইসব জমির বর্তমান বাজারমূল্য ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা। (৬) সমগ্র দেশে ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবারসমূহ (বাদী-বিবাদীসহ) বছরে ১২ হাজার ৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। (৭) ভূমি মামলাসংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ), ৫০ শতাংশ ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ নেন পুলিশ-থানা, ১৫ শতাংশ ভূমি অফিস, ১৪ শতাংশ কোর্টের কর্মকর্তা)। (৮) এ মুহূর্তে সারাদেশে যারা ভূমি মামলায় জড়িত, তারা মামলা পরিচালনে ইতিমধ্যে ২৫ হাজার ৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীর প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হবে। কারণ, আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসাব করা হয়নি অথবা হিসাব করা সম্ভব হয়নি—তা হলো: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরনের বাহ্যিকতা ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি

তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে তার অর্থমূল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখমের ফলে বহু ধরনের যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থমূল্য (cost of corruption) (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ও রায় ২০০৪: ২৯১-২৯২)।

একদিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি মামলা, আর অন্যদিকে তা অর্থনীতি ও রাজনীতির অধিকতর দুর্বৃত্তায়নে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচারব্যবস্থা অকার্যকর করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চিরস্থায়ীকরণে ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃঙ্খলা ও বিচারের সিস্টেমে শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা—যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন।

ভূমি মামলায় সবচেয়ে বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা—যারা দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, নারীপ্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ যাদের মধ্যে আছেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যাস্বল্প মানুষ, আদিবাসী মানুষ, উপকূলীয় 'ভঙ্গুর' মানুষ, চরের মানুষ।

প্রচলিত ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না, উভয়েই হারেন (losing battle for both)। কারণ, শেষপর্যন্ত মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও)—যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি। ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদীনির্বিশেষে মামলাধীন পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সব উন্নয়নসহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে ক্ষয় করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পেছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্যপরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক-জাতীয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভূমি মামলা পরিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যসম্পর্কের বিনষ্টীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

ইদানীংকালের 'আধুনিক' ভূমি মামলায়, যেখানে মামলার পেছনে থাকে জমি-জলা-বনদস্যু বাহিনী (হতে পারে তা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অথবা জমির দালাল গোষ্ঠী

অথবা জমি-জলা-বনদস্যু কালোটাকা বিনিয়োগকারী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী)—তারাই মামলায় জেতে—প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন। ভূমি মামলা কর্পোরেটাইজড। মামলার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত ব্যক্তিদের 'চেইন'টি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রক—রেন্টসিকিং সিস্টেম (দেখুন, বারকাত ২০২০: ৩০২)।

মামলার বাদী-বিবাদী নন, অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের অনেকেই নিঃস্ব ভূমিহীন মানুষ) অনেকে যারা যেকোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ—তারা মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে তাদের ভঙ্গুর জীবনীশক্তিটিও হারিয়ে ফেলেন। মামলার এসব সাক্ষী, যারা অন্যের হয়ে সাক্ষ্য দিতে কোর্টে হাজিরা দেন—প্রথম প্রথম তাদের কিছু ব্যয়ভার বহন করেন বাদী অথবা বিবাদী। কিন্তু, ভূমি মামলা তো চলে ৩ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত। মামলা চলার একসময়ে বাদী অথবা বিবাদী তাদের পক্ষের সাক্ষী-দরিদ্র মানুষটিকে কোনোমতে জীবন পরিচালনের জন্য আগের মতো টাকাপয়সা দেয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকে মামলার সাক্ষী দরিদ্র-দিনমজুর-ভূমিহীন মানুষটি মামলার শুনানির দিনে বাধ্য হয়ে নিজখরচে কোর্ট-কাছারিতে হাজিরা দিতে যাওয়া শুরু করেন। অবস্থাটা শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় এ রকম—দরিদ্র মানুষটির আয় কমে যায়, ঋণ বাড়তে থাকে, পরিবারের খাদ্য পরিভোগ কমে যায়, পরিবারের দুর্দশা বাড়ে, সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যয় বহনের নিম্নতম ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়, দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে যা ছিল তা-ও তিনি বিক্রি করতে বাধ্য হন। দরিদ্র ওই মানুষটি ভূমি মামলার বাদী অথবা বিবাদী নন, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই মামলাটাই তাকে দরিদ্র থেকে করে নিঃস্ব আর নিঃস্ব থেকে ভিক্ষুক। অর্থাৎ ভূমি মামলা দরিদ্র মানুষের জন্য "প্ররোচিত আত্মহত্যা"র শামিল।

১৭। এ গ্রন্থে আমাদের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয় হলো 'জমি-জলা'সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ের—খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল এবং ভূমি ব্যবহারের—আইন ও তা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি। আমরা সে কাজটিই করেছি। রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের নিরিখে ভাবনা-চিন্তার পদ্ধতিতাত্ত্বিক ভিত্তি হওয়া উচিত 'বড় পর্দায়'; যে পর্দার অন্তরালের অধীনস্থ বিষয় হবে ছোট পর্দার এসব আইন-কানুন। কেন "বড় পর্দা"? এর পেছনের যুক্তি হিসেবে আগে বলেছি পরেও বলব। তবে সহজবোধ্য যুক্তি হিসেবে দার্শনিক প্লেটোর একটি বক্তব্য—প্রণিধানযোগ্য: "চিকিৎসকদের কাছে অনেক রোগের নিরাময় অজানা। কারণ তারা শরীরের সব অঙ্গ সম্পর্কে জানেন না। অঙ্গের একাংশের নিরাময় সম্ভব নয় যদি পূর্ণ অঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে"।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অন্ততপক্ষে এ কারণেও যে ছোট পর্দার বিষয়াদিকেই প্রায়শ আমাদের সামনে বড় পর্দার বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে যুক্তিজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। কাজটি করে শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার প্রচার-প্রোপাগান্ডামাধ্যম। আর এই কাজটি

করানো হয় 'মিডিয়াসৃষ্ট' এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে।[৩] এ হলো কোনো বিষয়ের বাহ্যিক আবরণকে (appearance) ওই বিষয়ের মর্মবস্তু (essence) হিসেবে চালনার সচেতন অপপ্রয়াস। এসবকেই বলা যেতে পারে জণগণের "অজ্ঞতার ঘোমটাকে" চিরস্থায়ীভাবে ঘোমটাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে "জনসম্মতি উৎপাদন" (consent manufacturing) অথবা "জনসম্মতি ইঞ্জিনিয়ারিং" (consent engineering)।

আমরা যে বড় পর্দার কথা বলছি সেটা হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধান।" আর ওই সংবিধানের মূল বিধানটি এড়িয়ে অথবা তা অমান্য করে কোনো আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হবে অসম্পূর্ণ, আংশিক, একপেশে এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত। তাই-ই আইন-কানুন প্রণয়ন ও তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের কয়েকটি মৌল বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে—হিসাবে রাখতে হবে। দেশের সব আইন-কানুনই সর্বোচ্চ আইন—"সংবিধানের" অধীনস্থ। সংবিধানে বিধৃত ওইসব আইন নিম্নরূপ:

(ক) "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদশ–সংবিধানের মূলনীতি" (সংবিধানের প্রস্তাবনা);

---

[৩] এ প্রসঙ্গে অনেক উদাহরণের একটা এ রকম: ২০১২-এর ২৯ জুলাই তারিখে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথে স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকল 'মিডিয়াসৃষ্ট' একশ্রেণির 'বুদ্ধিজীবীদের', যারা নিজেদের 'সামাজিকভাবে মর্যাদাবান' মনে করেন; এবং যাদের ভেতরটা সম্পর্কে অথবা মতাদর্শ সম্পর্কে দেশের মানুষ খুব একটা অবগত নন। এরপরেই দৃশ্যমান মূল খেলা শুরু—অন্তত মিডিয়াতে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নয় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই যে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব তা 'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার' অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, রাষ্ট্রচিন্তক, রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই সমর্থন করেননি। তাদের মূল কথা হলো: বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব। নিজের অর্থে যে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম তা নিয়ে তারা শুধু সন্দেহ-সংশয়-বিদ্রূপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা রীতিমতো এর বিরোধিতা করেছিলেন—হিংস্র বিরোধিতা। অর্থনীতি, অর্থায়ন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, সক্ষমতাসংশ্লিষ্ট জটিলসব বিষয় উত্থাপন করে তারা জনগণকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন। আর এসব বিরোধিতা মারাত্মক মারমুখো স্থূল রূপ নিলো ঠিক সেই দিনক্ষণ থেকে, যখন বিশ্বব্যাংক (দুর্নীতির ষড়যন্ত্র-এর কথা বলে) পদ্মা সেতুর জন্য তাদের প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি বাতিল ঘোষণা করল। 'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার' আমাদের বুদ্ধিজীবীরা—অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিশ্লেষক, বিরোধীদলীয় রাজনিতিবিদের কথা নাই-ই বা উল্লেখ করলাম—নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের নিম্নতম সম্ভাব্যতা বাতিল এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব নয় এবং সঠিকও নয়—এসব বলার জন্য তারা ঠিক সেই সময়টা বেছে নিল, যখন বিশ্বব্যাংক চেয়েছিল—'সরকার পরিবর্তন' (regime change)। আমার মতে, সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাদের দেশীয় জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীদের শুধু মতামতের (opinion) বিষয় ছিল না—আসলে বিষয়টি ছিল গভীর মতাদর্শিক (ideological)। আর এই মতাদর্শটির নাম নিও লিবারেলইজম, যার প্রধান লক্ষ্য হলো—পুঁজিবাদের রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশনের (ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন) স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ সমধর্মী সংস্থাদের দালালি করা, যার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমের অধীনস্থ সত্তা হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে ধরে-বেঁধে রাখা সম্ভব হয় (দেখুন, বারকাত ২০২১: ৯৩-৯৪)।

(খ) "রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে" (সংবিধানের প্রস্তাবনা);

(গ) "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।...। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" [অনুচ্ছেদ ৭। (১) ও ৭। (২)];

(ঘ) "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে" (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১১);

(ঙ) "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা, এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা" (অনুচ্ছেদ ১৩);

(চ) "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে–কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা" (অনুচ্ছেদ ১৪);

(ছ) "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়–(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৫);

(জ) "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" (অনুচ্ছেদ ১৬);

(ঝ) "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" (অনুচ্ছেদ ১৮ ক);

(ঞ) "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)];

(চ) "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন" [অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)];

(ছ) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৯। (১)]।

প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন—আমাদের সংবিধান—স্পষ্ট বলছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হবেন জনগণ এবং জনগণের জীবনমান ক্রমান্বয়ে উন্নতির লক্ষ্যে গড়তে হবে শোষণমুক্ত সমাজভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাম্য ও সম-অধিকার, বিলুপ্ত করতে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্য, প্রতিষ্ঠা করতে হবে উৎপাদনের উপায়ের ওপর রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী মালিকানাসহ কৃষিবিপ্লব এবং প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন। এসব হলো 'গণতন্ত্রের' মর্মকথা। কারণ, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো 'সম্মতি' (consent)—"জনগণের সম্মতি" (people's consent)। আর সংবিধান হলো 'জনগণের সম্মতির' সর্বোচ্চ আইনি দলিল। সুতরাং বাস্তব জীবনের আইন-কানুন—খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলসহ ভূমি ব্যবহার যেটাই হোক না কেন, তার যতটুকু সংবিধানবিধৃত উল্লিখিত দিকনির্দেশনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক ততটুক বাতিল বলে পরিগণিত হবে [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭। (২)]। এটা আমাদের সংবিধানেরই বিধান

১৮। আমরা কয়েকটি 'স্থির' (অন্তত, আজকের এবং নিকট-ভবিষ্যতে আমাদের দেশ কিংবা তুলনীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি—

ক। ভূমি, আইন, এবং আইনের বাস্তবায়ন পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়—যা আমাদের জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের এক অন্যতম চালিকাশক্তি।

খ। রাষ্ট্র-অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতি কিংবা অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে ভূমি-আইন একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা শাসকের পক্ষে শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু আত্মসাতের পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয় মাত্র।

গ। আইন মন্দ, নানান দোষে দুষ্ট—নানান 'ভদ্র মোড়কে' শোষক বা শাসকের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই লাগে। তদুপরি, আইনের বাস্তবায়ন মন্দতর—আইনের যেটুকু আপাত-ভালো, সেটুকুও শাসিতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে না; বলা ভালো—করতে দেয়া হয় না।

ঘ। ভূমি, ভূমি-আইন এবং ভূমি আইনের বাস্তবায়ন কীভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সাথে জড়িত এবং তার জীবনের গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে-প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার বিশ্লেষণ একমাত্রিক নয়—বহুমাত্রিক। এই বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যাটির গভীরে (root cause) যেতে হলে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার (tool)।

১৯। একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং সে প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে যে—আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে এসেই থাকি যে ভূমি-আইন শুধু শাসকের পক্ষেই যাবে এবং তা শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের নামে আত্মসাতেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে কী হবে? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট উত্তর। উত্তরগুলো কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক। জ্ঞানচর্চা একটি নির্মোহ প্রক্রিয়া। এখানে পক্ষ-বিপক্ষনির্বিশেষে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নবাণ, নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ, নতুন চর্চা ঘটাটাই স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ চর্চা। এটাই সত্য উদ্‌ঘাটনের নির্মোহ পথ। এই জ্ঞানচর্চার ফল, তাৎক্ষণিক কে পেল, সেটি বিবেচনা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয়।

খ। পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণকৌশল নানান ধরনের হয়। গবেষণার ফলাফল, বিশেষ করে সামাজিক-গবেষণা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে, কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপরও নির্ভরশীল। গবেষণা ফলাফল, তা সে যতই শক্ত অনুমিত ধারণার (Assumption অর্থে) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াক না কেন—তার গুণগতমান এবং নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিকতার ওপরও নির্ভর করে। সেই বিবেচনায়, ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"-ভিত্তিক হাতিয়ার ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন

এতদ্‌সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে, আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। যা, সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে; সহায়তা করবে প্রয়োজনীয় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে "অজ্ঞতার বোরখা" থেকে বেরুতে।

গ। কাগজে-কলমে গবেষণার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করি। তারপরও, গবেষণার-ফলাফলের ব্যবহারিক দিকটিও আমরা বিবেচনায় নিই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, বিশেষ করে, তা যদি আমাদের বিদ্যমান সমাজকাঠামোর নিচতলার মানুষের, অধিকারহীনতা-দারিদ্র্য-বঞ্চনা লাঘবে একটু হলেও শক্তি যোগায় তাহলে সেই গবেষণা এবং গবেষণা ফলাফলের প্রচারণাকে আমরা নৈতিক অবস্থান থেকেই সমর্থন করি। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজগঠনে এটা গবেষকের দায়বদ্ধতাও বটে। এখানে নোয়াম চমস্কির ধারণাটা বলে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে একজন সমাজসচেতন গবেষক মাত্রেই হবেন একই সাথে জীবনসংলগ্ন বুদ্ধিজীবী (organic intellectual) এবং ন্যায্য-আন্দোলনসম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী (activist intellectual); এহেন বুদ্ধিজীবীর মূল দায়িত্ব হবে—সত্য বলা এবং মিথ্যে উন্মোচন করে জনসম্মুখে উত্থাপন করা। আর অ্যান্থনি গ্রামসির মতে, এ ধরনের গবেষক-বুদ্ধিজীবীর অন্যতম বিশ্বাস হবে—"বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সন্দেহ আর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আশাবাদী" (pessimism of the intellect and optimism of the will)।

২০। আগেই বলেছি, আদর্শ অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে 'শাসক' আর 'শাসিত' হয়ে উঠবেন একটি একক সত্তা। অর্থাৎ, আদর্শ অবস্থাটি হচ্ছে এমন, যেখানে 'শাসিত = শাসক'। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা—তা সে যে-নামে যে-পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন—কোনোভাবেই এমন একটা অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে দেবে না—যেখানে 'শাসিত = শাসক' এমন সমীকরণ সত্য হয়ে উঠবে। এমতাবস্থাকে যদি আপাতত সত্যি বলে মেনে নিই, বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিই—তাহলে আমরা একটি 'প্রায় সমান ($\cong$)' অবস্থার দিকেই যেতে চাইব; যদিও আমরা খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত আছি যে 'প্রায় সমান' অবস্থা কোনো প্রকৃত সমাধান দেবে না। তারপরও, যখন নিকট বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলাই যায় যে, 'সমাজপরিবর্তনের বিপ্লব' তৈরির মতো কোনো ভ্রূণাবস্থাও কোথাও বিরাজ করে না—সে রকম একটা সময়ে এবং অবস্থানে আমরা সচেতনভাবেই 'শাসক' এবং 'শাসিত' এই দুই সত্তাকে 'প্রায় সমান' কীভাবে করা যায় সেই পথনির্দেশের সন্ধান করেছি।

অর্থাৎ, আমাদের এই গবেষণা ততটুকুই করতে পারে—যেখানে ওই তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকাঠামো এমন একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে, যেখানে 'শাসিত ≅ শাসক'।

২১। আমরা এটি জানি যে 'প্রায় সমান' অবস্থায় নেবার মতো আমাদের গবেষণা-উদ্ভূত সুপারিশমালা তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি' অথবা 'সুশীল সমাজ'-এর কার্যক্রমের সাথেই তুলনা করবেন অনেকে। মুক্তচিন্তা ও চিন্তার স্বাধীনতার কারণে তা তারা করতেই পারেন।

তবে আমরা ওদের তুলনায় ভিন্ন, পুরোপুরি ভিন্ন। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে আমরা যুক্তিসঙ্গত সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলি যে দেশের ২ কোটি বিঘা খাসজমি-জলা ১ কোটি ভূমিহীন-নিঃস্ব-বঞ্চিত-প্রান্তিক মানুষের খানা-পরিবারের মধ্যে বণ্টন জরুরি (যা 'সুশীল'রা বলবেন না)। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে দার্শনিক রুশোর মতো বলতে পারি—"বৈষম্য-অসমতা-অবিচার সৃষ্টির উৎস হলো সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা" (যা 'সুশীল'রা কখনোই বলবেন না)। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে আমরা বলি যে "শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী ও গরিবের সমাজের প্রতি সমান ও সমদায়িত্ব যুক্তিহীন বিষয়" (যা 'সুশীল'রা বুঝলেও বলেন না, মানেন না)। আমরা বিশ্বাস করি যে গরিব মানুষের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মতো কিছুই নেই; আর তাই বলি—বিদ্যমান শোষণভিত্তিক কাঠামোতে ওদের জন্য "সুযোগের সমতা" যুক্তিহীন—ভিত্তিহীন বিষয়; আরো বলি যে ওই "সুযোগের সমতা"র বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ন্যায়সঙ্গত ('সুশীল'রা এসব জানলেও জানতে পারেন, কিন্তু শোষণভিত্তিক সমাজে যুক্তি-ভিত্তি-নীতি-নৈতিকতাহীন "সুযোগের সমতা"র কোরাস অব্যাহত রাখেন)। আমরা বলি যে, যেকোনো সুস্থ-শোভন সমাজের দায়-দায়িত্ব-বিধি হওয়া উচিত "সুবিধা" বা "লাভ" (benefit) এবং "বোঝা" বা "ভার" (burden) উভয়ই সমাজের সবাই মিলে মোটামুটি সমভাবে ভাগাভাগি করে নেয়া; কিন্তু 'সুশীল'রা যা নসিহত করেন, তার নিহিতার্থ হলো—'সুবিধা' বা 'লাভ'-এর মালিক হবেন সমাজে শ্রেণিমই-এর উপরতলার কিছু মানুষ—"সভ্যতার প্রভু" পুঁজিপতি-অর্থবিত্ত-সম্পদের মালিক শ্রেণি (তবে কিছুটা চুইয়ে নিচের দিকে গেলে অসুবিধা নেই); আর সব 'বোঝা' বা 'ভার' বহন করবে শ্রেণিমই-এর নিচতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ—শোষিত মানুষ (রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এসব ব্যবস্থার নাম দাস, সামন্ত, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা)। আমরা অন্যায্য দাস-সামন্ত-পুঁজিতান্ত্রিক সিস্টেমের সমালোচকই শুধু নই, আমরা ওসব উল্টানোর পক্ষে। আর 'সুশীল'রা ওইসব সিস্টেম জিইয়ে রাখার নিরাপোস সমর্থক-রক্ষক—এককথায় বুদ্ধিবৃত্তিক ভৃত্য-দাস। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার প্রতি অনুগত-বিশ্বস্ত, আর 'সুশীল'রা ক্ষমতার যেকোনো রূপ—সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, অনির্বাচিত এবং তথাকথিত নির্বাচিতনির্বিশেষে সবধরনের শাসনব্যবস্থার প্রতি সদাবিশ্বস্ত ও আনুকূল্যপ্রত্যাশী। আমরা ততটুকু ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে উচ্চকণ্ঠে বলি যে রাজা-বাদশা-

সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা "প্রকৃতিগতভাবেই বৈধ" (যা 'সুশীল'রা কখনো বলবেন না, তবে রাজা-বাদশার পতন হলে বলেন)। আমরা ততটুকু ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রামে শ্রেণিসংগ্রামের ভূমিকার অনস্বীকার্যতার কথা বিশ্বাস করি, উচ্চারণ করি এবং যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণে সচেষ্ট—আর বিপরীতে সব 'সুশীল' তো "মতাদর্শের মৃত্যু" (end of ideology) তত্ত্ব সত্য বলে ঘোষণা দিয়ে এখন বাজার অন্ধত্বের একপক্ষীয়-কর্পোরেট শ্রেণিসংগ্রামে (one-sided class struggle) বা প্রতিপক্ষহীন শ্রেণিলড়াইয়ে আপোসহীন মহাযোদ্ধা। আমরা ততটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে বলতে পারা যায় যে আইন-রাজনীতি-অর্থনীতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন কোনো ভিন্ন প্রপঞ্চ বা ধারণা নয়। আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যেখান থেকে বলা যায় যে 'ভূমি আইনের সমস্যা' কোনো 'আইনি সমস্যা' নয়—এটি সব বিচারেই রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। আমরা এইটুকুই শুধু ভিন্ন, যখন বলা যায় যে 'খুপড়িভুক্ত' ও 'বিচ্ছিন্ন' দৃষ্টি এবং গবেষণা দিয়ে ভূমি আইনের সমস্যার আইনি বিশ্লেষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-অধিকারমুখী কোনো বাস্তব ফলাফল তাতে অর্জিত হবে না (সুশীল সমাজ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৫, পৃ. ২১৯-২২৪)।

২২। এটুকু আমাদের জানা আছে যে, 'নয়া-উদারবাদ'[৪]-এর 'মহা-ফাঁদ' পেতে রাখা বর্তমান যে বিশ্ব, সেখানে যিনি দুর্বল, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে যার অবস্থান—"আইন" ছাড়া আর তার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আমরা জানি যে আইনের প্রয়োগ-অর্ধপ্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সবচেয়ে নিষ্ঠুরভাবে ঘটানো হয় এই 'বহিঃস্থ' মানুষের ক্ষেত্রেই। রেন্টসিকার,

[৪] বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে হলে "নয়া-উদারবাদ" বা "নব্য-উদারবাদ" (Neo-liberism)—এর ওই মহা-ফাঁদ সম্পর্কে নির্মোহ ধারণা থাকা জরুরি। নয়া-উদারবাদের মর্মবস্তু সংক্ষেপে এ রকম: (১) নব্য-উদারবাদী মতবাদ (Neo-liberal doctrine) হলো অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের (যাঁদের অন্যতম এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো) অবাধ বাজার বা মুক্তবাজার মতবাদের (Laissez fare doctrine) আধুনিক সংস্করণমাত্র। তবে তা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী, অনেক বেশি আধিপত্যবাদী। (২) আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (financialzed capital) আধিপত্যের (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে)—১৯৫০ থেকে অদ্যাবধি—এ মতবাদ কোনো ধরনের দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া স্পষ্ট বলে যে, যদি তোমরা আধিপত্য বজায় রাখতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন হলো—"মুক্তবাজার-অবাধ বাজার-বাধাহীন বাজারব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো, যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না; সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও; রাষ্ট্রকে নৈশপ্রহরীর চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না।" (৩) নব্য-উদারবাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদের আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত মতাদর্শ, যা কোনো মানদণ্ডেই জনকল্যাণকর নয়—কোনো দেশেই, এবং যা দেশে দেশে "রেন্ট-সিকার" লুটেরা গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনির্মিত দর্শন। দেশজ রেন্টসিকিং-লুটতান্ত্রিক কতিপয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ জিইয়ে রাখার প্রয়াসেই বিনির্মিত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ। (৪) নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতাদর্শ বলে—"আজকের যুগের উন্নত-ধনী দেশসমূহ মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতি অবলম্বনে ধনী হয়েছে"—এ কথা নির্জলা মিথ্যা। আসলে এক কালের গরিব দেশসমূহ সংরক্ষণবাদী নীতিকৌশল প্রয়োগে ধনী হবার পরে "উপরে ওঠার মই লাথি মেরে সরিয়ে ফেলেছে" এবং গরিব দেশগুলোকে উপরে ওঠার মই ছাড়াই মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতিকৌশল অবলম্বনে বাধ্য করছে। (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ২০১৮: ১২১-১৫৩; বারকাত ২০২০: ৩৭৩-৩৮২; বারকাত ২০২১: ৯৩-১০৩)।

দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষপর্যন্ত ভূমির দখল রাখে, ন্যায্য হিস্যা হারায় বাকিরা। তারপরও আইনি দলিলে যা বলা আছে, যা করবার কথা বলা আছে কাগুজে দলিলে—তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, তা অন্তত মন্দের ভালো হতে পারে। ভূমি বিষয়ে সব আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি কাঠামোর মধ্যে এনে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নিশ্চিত করে, জনসম্পৃক্ত একটি বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মাঠপর্যায়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে অন্তত, যাত্রা শুরু করতে পারে 'শাসিত'-কে 'শাসক'-এর 'প্রায় সমান' করে তোলবার বন্ধুর রাস্তায়। অন্যথা দরিদ্র মানুষ, জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী, আদিবাসীসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ভূমি অধিকার, তথা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করবার দিকে এগোনোই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে না 'বাদপড়া' জনগোষ্ঠীকে শোভন উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবার দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়া।

এই বিবেচনাতেই, এই গবেষণায় আমরা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্সে এ দেশের কয়েকটি ভূমি-আইন—যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত, অধিকার-ভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক—বিশ্লেষণ করেছি, খুঁজে বের করেছি সেগুলোর বাস্তবায়নসমস্যা, বের করতে চেয়েছি উত্তরণের পথ-পন্থা। আমরা ভালো করেই জানি, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, শাসন ব্যবস্থায় আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলেও 'শাসক' কখনোই 'শাসিত'-এর সমান হয়ে উঠবেন না; বড়জোর তারা হয়ে উঠতে পারেন 'প্রায় সমান' (তবে কতটুকু গেলে বা কত দূর পৌঁছালে 'প্রায় সমান' বলা যাবে তা জানি না)।

২৩। এই গ্রন্থের ভাষা 'বাংলা'—এটা আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত। আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই আমাদের মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্যই এই ভাষা নির্বাচন। গবেষণাগ্রন্থের ভাষা ইংরেজি হলে বিদেশি মহলের বাহবা কুড়ানো সহজ হয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ওই 'বেচে' 'বেশ করে-কম্মে খাওয়া'ও যায়। কিন্তু এই বইয়ের বিষয় এতটাই কৃষক-জলাজীবীর-দরিদ্র-প্রান্তিকের, এতটাই এ দেশের ভূমি-উদ্ভূত, এতটাই একান্তই 'বাংলাদেশ'-এর যে, এর ভাষা 'বাংলা' হওয়ারই দাবি রাখে। এ আমাদের কোনোই ইংরেজি বিরাগ নয়—বরঞ্চ এটি আমাদের যুক্তিনির্ভর সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।[৫]

---

[৫] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট্ট করে বলেছেন, "মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা মাতৃদুগ্ধসম"। প্রকৃত অর্থে একজন মানুষ যে 'ভাষায়' ভাবনা-চিন্তা করেন, যে ভাষায় স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় দৈনন্দিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন ওই ভাষার সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রগতি, চিন্তাজগতের বিকাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ভাষাটি 'বাংলা'। সুতরাং শিক্ষার সব স্তরে বাংলা ভাষাকে জ্ঞানচর্চার মূল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষাকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্য কোনো ভাষা শিখব না। অবশ্যই শিখব এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে সব শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে দুটি বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে (দেখুন, বারকাত, আবুল ২০২০: ৩৪৪)।

বাংলায় লিখিত হলে, তা এ দেশের বেশি মানুষের বোধগম্য হবে, সহজবোধ্য হবে—এও আমাদের ধারণা। তবে, এ দেশ এক ভাষার দেশ নয়। আমাদের নানান আদিবাসী গোষ্ঠীর নানান ভাষা রয়েছে। নিজ নিজ ভাষায় তারা এই গ্রন্থ পড়তে পারলে, আমরাও খুশি হতাম। কিন্তু এ আমাদেরই অক্ষমতা যে তেমনটি পারিনি আমরা। তবে পরবর্তীতে—এই গ্রন্থের ফলাফল শুধু নয়, গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক গুরুত্বের বিবেচনাতেই—ইংরেজিসহ অন্য ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া জরুরি বলে মনে করি। সঠিক ('যোগ্যতা' অর্থে নয়; নৈতিকতা, রাজনৈতিক এবং যোগ্যতার নিরিখে সঠিক) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে আমরা আনন্দিত হব।

২৪। বাংলাদেশে ভূমি আইন বিষয়ে গবেষণা নিতান্ত কম। ভূমি আইনের অ্যাকাডেমিক, ব্যবহারিক গ্রন্থবাজারে সহজলভ্য—যেগুলো মূলত সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি ইত্যাদির ই হয়। গবেষণার বিষয় হিসেবে ভূমি আইন জটিল, এর বাস্তবায়ন সমস্যা জটিলতর—সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার ঘাটতি থাকবার এটি অন্যতম মুখ্য কারণ। কিন্তু এটা বলা বাহুল্য যে ভূমি আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে নিবিড় গবেষণানির্ভর প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয়তা সবসময়ই অনুভূত হচ্ছিল। এ ধরনের গবেষণা এ-সংক্রান্ত নীতি চিন্তা-আন্দোলন-সংগ্রামকে যোগায় প্রেরণা, দেয় জ্ঞানভিত্তিক-নৈতিক শক্তি।

এই বাস্তবতার গুরুত্ব বিবেচনা করে চেতনায়নকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি'-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একটি গবেষণা পরিচালনা করে। মাঠজরিপভিত্তিক এই গবেষণার শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশের ভূমি আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যা: কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, জলমহাল, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, এবং ভূমি ব্যবহারবিষয়ক আইন ও নীতিমালা (২০২০)"। এই গ্রন্থের গ্রন্থকারবৃন্দ ছিলেন ওই গবেষণার পুরোভাগে।

ওই গবেষণায় প্রাপ্ত জরিপভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—যা জ্ঞানভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনি অধিকসংখ্যক মানুষের হাতে পৌঁছাবে, এবং এ-সংক্রান্ত সংগ্রামের নৈতিক ভিত্তি গঠনে সহায়তা করবে। এই প্রেক্ষিতেই 'নিজেরা করি'র সহযোগিতায় প্রকাশনা সংস্থা 'মুক্তবুদ্ধি' এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। তার ফলশ্রুতিতেই এই গ্রন্থ।

২৫। এই গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা যেন অনুধাবন কিংবা পুনঃঅনুধ্যান করতে পারি যে আদর্শ অবস্থান থেকে আইনের অবস্থান অনেক দূরে, আবার সেই অবস্থান থেকেও

বাস্তবায়ন অবস্থার দূরত্ব অনেক—রেন্টসিকার পরিবেষ্টিত, দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ভূমির ওপর কৃষিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা (শুধু অভিগম্যতা বা access নয়) নিশ্চিত করা। অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া, সাধারণ মানুষের বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জীবনে কোনো ন্যূনতম ইতিবাচক পরিবর্তনেরও টেকসই সমাধান সম্ভব নয়। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। দরিদ্র-ভূমিহীন-বিত্তহীন-প্রান্তিক মানুষের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া কৃষি-ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন—বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌলিক সংস্কার।

২৬। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে, বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরো মাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি। আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব। বিষয়টি শ্রেণিস্বার্থীয়।

এই গ্রন্থের পাঠকমহলকে অশেষ শ্রদ্ধা ও আগাম কৃতজ্ঞতা।

আবুল বারকাত
প্রধান গবেষক ও গ্রন্থকার

ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো. অলিউল ইসলাম

দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ মানুষকে
আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালা—এসব না বুঝতে দেয়াটাই
আইনবিষয়ক প্রচার-প্রপাগান্ডার মুখ্য বিষয়। কিন্তু যখনই
দরিদ্র-প্রান্তঃস্থ ব্রাত্যজন ফাঁকফোকর বুঝে "অজ্ঞতার ঘোমটা" থেকে
বেরিয়ে ওইসবের বিরুদ্ধে সংগঠিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা উল্টে
দিয়ে নিজেদের জন্য ন্যায্য-ন্যায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট
আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, তখন আর এখনকার এসব
আইন-কানুন-বিধি-বিধান-নীতিমালার অস্তিত্ব থাকবে না। তখন
দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষবিরুদ্ধ এবং ধনী-রেন্টসিকার-লুটেরা-পরজীবী
শ্রেণির স্বার্থোদ্ধারউদ্দিষ্ট জমি-জলা-জঙ্গলসংশ্লিষ্ট এসব আইনই শুধু
নয়, আইন বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহও ভেঙে পড়বে। এসবই
হলো সমাজপরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতির ভেতরের কথা।

—আবুল বারকাত

৳600 BDT
$40 US
€30 EU
£25 UK

ISBN 978-984-95689-4-0
9 789849 568940

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

প্রকৃতির বিচারে ভূমির উপর অধিকার হওয়া উচিত সর্বজনীন। কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক সমাজে ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিচায়ক। দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের জন্য এক টুকরো ভূমি অমূল্য সম্পদ, তার সমগ্র অস্তিত্ব। জমিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের কাছে ভূমি-ই একমাত্র অবলম্বন। অথচ, প্রান্তিক মানুষ ভূমি-অধিকারের ক্ষেত্রে স্থান-কাল নির্বিশেষে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত।

এটুকু আমাদের জানা যে ভূমি আইন মন্দ, আর আইনের বাস্তবায়ন মন্দতর। আইনের যেটুকু আপাত ভালো, সেটুকুও শাসিতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে না। তারপরও, বিদ্যমান এই রাষ্ট্র-কাঠামোয় আইনের নিজের অধিকার রক্ষায়, 'কণ্ঠহীন' মানুষের, আইনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আপাতত কোনো বিকল্প নেই। তাই আইনি দলিলে যা বলা আছে তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, অন্তত মন্দের ভালো হতে পারে।

ভূমি আইনের সমস্যা নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে তেমন কোনো সুসংবদ্ধ গবেষণা হয়নি। বিশেষত, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর ক্ষেত্রে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা হয়নি বললেই চলে। সেই বহু কাঙ্ক্ষিত গবেষণার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ।

ভূমি-অধিকার নিয়ে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত সংগ্রামের জ্ঞান-ভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' নির্ধারণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে—সেটির যেমন তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি ঐ সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। যা, সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে।

আবুল বারকাত, *পিএইচডি*, অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার। সমাজ-অর্থনীতি-ভূমি-রাজনীতি বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ, প্রবন্ধ, মনোগ্রাফ, অভিসন্দর্ভ, লোকবক্তৃতা সব মিলিয়ে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা প্রায় আটশত। তার সর্বশেষ প্রকাশিত ধ্রুপদী গবেষণাগ্রন্থ, "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (২০২০) অতি অল্প সময়েই সারস্বত সমাজে-চিন্তা জগতে তুলেছে আলোড়ন। 'গণমানুষের অর্থনীতিবিদ' আবুল বারকাত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি।

আসমার ওসমান, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন গবেষক ও সাহিত্যিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। প্রান্তিক মানুষের অধিকার-জীবন-জীবিকা ও অভিবাসন তার আগ্রহ এবং গবেষণার মূল ক্ষেত্র।

গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। ভূমি ও কৃষি প্রশ্ন, প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমিতে প্রবেশাধিকার, গ্রামীণ জীবিকা ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ তার আগ্রহ ও গবেষণার মূল ক্ষেত্র।

মো. অলিউল ইসলাম, আইনজীবী এবং গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। ভূমি আইন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা তার আগ্রহ এবং গবেষণার মূল ক্ষেত্র।